শাক্ত পদাবলী

সাধনতত্ত্ব ও কাব্য-বিশ্লেষণ

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য-বিভাগ
হিন্দু কলেজ, গোবরডাঙ্গা

এস্ ব্যানার্জি এণ্ড কোং
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট • কলিকতা ৯

॥ প্রকাশক ॥

শ্রীরীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

॥ পরিবেশক ॥

বামা পুস্তকালয়

১১-এ, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা-১২

॥ মুদ্রাকর ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ পান

লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেস

২০৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

॥ প্রচ্ছদপট ॥

শ্রীসুমুখ মিত্র

॥ মূল্য ঃ তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা ॥

॥ বিষয় সূচী ॥

নিবেদন

মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক বাঙ্গলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। একক এবং বিচ্ছিন্ন কবিতা হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলীর পরই শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। মহাজন পদাবলী এবং প্রসাদী সঙ্গীত এখনও সমভাবে বাঙ্গালীর চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শাক্ত সঙ্গীতের আবেদন যে বাঙ্গালীর নিকট কত গভীর তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। তবে সাধারণতঃ এই সঙ্গীতের বিষাদ-করুণ স্বরটিই বাঙ্গালীর শ্রবণ ও মন পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। যে সকল পদকে আশ্রয় করিয়া এই স্বরের উচ্ছ্বাস সেইগুলি সম্পর্কে বড় বিশেষ কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন না। দেখিলেও রূপকাশ্রিত ঐ সকল পদের মর্মোদ্‌ঘাটন দুরূহ বলিয়াই মনে হয়। কারণ যে শক্তিতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বকে এই সঙ্গীতগুলি রসরূপ দিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে সম্যক পরিচয় না থাকিলে শাক্ত সঙ্গীতের রসাস্বাদন পুরাপুরি সম্ভব নহে।

এই গ্রন্থে শক্তিতত্ত্ব ও সাধন্‌তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া শাক্ত পদাবলীর বিভিন্ন অংশকে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'শাক্ত পদাবলী' সংগ্রহ গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়াছি। শাক্ত পদাবলী বি. এ. স্পেশ্যাল বাঙ্গলা এবং বাঙ্গলা অনার্সের জন্য নির্দিষ্ট গ্রন্থ। এই বিষয় পাঠেচ্ছু ছাত্র এবং অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠক—এই উভয়দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করিয়াছি। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বন্ধুজনের নিকট

হইতে মূল্যবান পরামর্শ পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের বাঙ্গলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুত ভোলানাথ ঘোষের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। তাঁহাকে ধন্যবাদ।

জানুয়ারী, ১৯৬০ সাল
হিন্দু কলেজ
গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

তান্ত্রিক সাধক যোগিপ্রবর

পূর্ণানন্দ স্বামীর বংশধর

কনিষ্ঠ মাতুল শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য

করকমলেষু

শাক্ত পদাবলী পাঠের ভূমিকা

১

জন্মলগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত প্রায় সাত আট শত বৎসরের বাঙ্গলা সাহিত্যকে মোটামুটি ধর্মকেন্দ্রিক বলা যাইতে পারে। এই ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। একক এবং বিচ্ছিন্ন কবিতা হিসারে বৈষ্ণব পদাবলীর পরই শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। বৈষ্ণবগীতি এবং রামপ্রসাদী গান এখনও সমভাবে বাঙ্গালীর চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

শাক্ত পদাবলীর উদ্ভবকাল হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। রামপ্রসাদী সঙ্গীত লইয়াই শাক্ত-গীতির জয়যাত্রা সুরু হয়। বাঙ্গলা দেশ বিশেষরূপে শক্তিপূজার দেশ, তবুও কেন শাক্ত গীতির উদ্ভব এত বিলম্বে হইল তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। অবশ্য অষ্টাদশ শতকের শাক্ত গীতিতে নিঃস্বার্থ ভক্তিবাদ কিভাবে বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া না গেলেও বাঙ্গলা দেশে শক্তিপূজা এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট সাহিত্যের ধারা বৈষ্ণব পদাবলী এমন কি তৎপূর্ব যুগ হইতে লক্ষিত হয়।

শক্তিই তান্ত্রিকের উপাস্যা দেবী এবং বাঙ্গলাদেশেই তান্ত্রিক মতবাদের সর্বাধিক প্রসার ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশে বহু দেবীর উদ্ভব হইতে দেখা যায়। তাহার কারণ ছিল দ্বিবিধ। ঐ সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধরা তাঁহাদের দ্রুত ক্ষীয়মাণ ধর্মের প্রভাব রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুধর্মের অনুসরণে কিছু কিছু দেবীর সৃষ্টি করিল। অপরদিকে

মুসলমানশক্তির আক্রমণে পর্যুদস্ত আত্মপ্রত্যয়হীন হিন্দুসমাজ নানা দেবীর সৃষ্টি করিয়া কোনমতে আত্মবিকাশের পথটি খুঁজিয়া পাইল। এই সকল নবসৃষ্ট দেবীদের অধিকাংশই ছিলেন উগ্র প্রকৃতি বিশিষ্ট। পরে অবশ্য তাঁহারা এই উগ্রতা হারাইয়া শান্ত হইয়া পড়িলেন—যেমন চণ্ডীদেবী। দেবী কালিকা এই ঘোরা দেবীদের অন্যতমা। ইনি বিশুদ্ধ তান্ত্রিক দেবী। এই দেবীকে কেন্দ্র করিয়া একদিকে যেমন বিচিত্র সাধনপদ্ধতির উদ্ভব হইল অন্যদিকে হইল কাব্যের উদ্ভব। মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের কালিকামঙ্গল কাব্যগুলিতে এই দেবীরই বন্দনা করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব কাব্যের যুগে কালিকামঙ্গল কাব্যগুলিতে কালিকাদেবীর বন্দনা করা হইলেও কাব্যগুলি অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের মতই কাব্য হিসাবে খুব বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ ইহাদের কাব্যমূল্য বিশেষ উঁচু দরের ছিল না; দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব কাব্যের রসে বাঙ্গালীর মন এত অধিক সিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, বৈষ্ণব কবিতার পাশে অন্য কোন কাব্যের স্থান তখন হওয়া সম্ভবপরও ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাব্যপ্রিয় বাঙ্গালীর হৃদয় বৈষ্ণব কাব্যের প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছিল। বৈষ্ণব কাব্যের মূলে ছিল ভক্তিরস। শাক্ত পদাবলীর মূলেও ভক্তিরসই বিদ্যমান। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ প্রভাবে বাঙ্গালীর মানস-চেতনায় যে ভাব-প্লাবনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রভাব প্রায় দুই শত বৎসর পর্যন্ত সমান কার্যকরী ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতেই এই ভাব-প্লাবন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল এবং স্বভাবতই ভক্তিরসের ধারা অন্য খাতে প্রবাহিত হইবার লক্ষণ দেখা দিল। এই লক্ষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শাক্ত-গীতিকাব্যের মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

ভক্তিরসের স্রোতের এই ধারা পরিবর্তনের পশ্চাতে এ যুগের সমাজচেতনা ও জীবনাদর্শ নিঃসন্দেহে কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর মধুর রসের সঙ্গে বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না বলিয়াই ইহার প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। তদুপরি পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত দেশের শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে যে শৃঙ্খলা ছিল তাহা অতঃপর শিথিল হইয়া আসিল। দৈনন্দিন জীবনে দেখা দিল অনিশ্চয়তা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা। এই যখন মানসিক অবস্থা তখন আর যাই হোক মধুর রসের কবিতা আস্বাদন করা সম্ভব নয়। ফলে বাস্তব অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কাব্যসৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিল। জগজ্জননী মাতার নিকট করুণ আবেদন জানাইয়া ভক্ত-সন্তান নিজেকে রক্ষা করিবার পথ খুঁজিয়া বাহির করিল। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরাও এই ভীতি ও স্বার্থবুদ্ধি হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সকল দেবীরা ছিলেন ভীষণা উগ্রা। তাঁহারা জোর করিয়া ভক্তের নিকট হইতে পূজা আদায় করিতেন। কিন্তু শাক্তগীতিতে বন্দিতা দেবীর কাছে ভক্ত স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিল এবং আত্মরক্ষার জন্য কাতর নিবেদন জানাইল। কেন এমন হইল? মঙ্গল কাব্যের নিষ্ঠুরা দেবী-সজ্ঘ ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, মুসলমান রাজশক্তির অত্যাচারের পটভূমিকায় এবং অনার্য ও বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রভাব হইতে জাত নিষ্ঠুর-প্রকৃতির দেবীকুল পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে ক্রমশঃ মঙ্গলদায়িনী দেবীরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেলেন। তখন এই সকল দেবীদের ভক্তের নিকট হইতে জোর করিয়া পূজা আদায়ের আর কোন প্রয়োজন রহিল না, ভক্তই স্বপ্রয়োজনে সন্তানবৎসলা দেবীর শরণাপন্ন হইল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত একশত বৎসরের বাঙলা দেশের ইতিহাস প্রজাপুঞ্জের উপর রাজশক্তির নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারের ইতিহাস। ধনী মুহূর্তের মধ্যে পথের ভিক্ষুকে পরিণত হয়, দরিদ্র বিনা কারণে প্রাণ দেয়—জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক অভাবনীয় অনিত্যতার প্রভাব দেখা দিল। এই নিদারুণ বঞ্চনা হইতে আত্মরক্ষার তাগিদে শাক্ত-গীতির জন্ম হইল। অত্যাচারের সম্মুখীন হইবার সাহস এবং অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার কামনা—এই দুই প্রকার মনোভাবের সংমিশ্রণ শাক্ত পদাবলীর মধ্যে পরিস্ফুট হইল। বৃহৎ কাব্যের আকারে দেখা না দিয়া—এই মনোভাব ক্ষুদ্র কবিতার মধ্য দিয়া কেন আত্মপ্রকাশ করিল এই কথাটি স্বভাবতই মনে আসিতে পারে। প্রথমতঃ এই কবিতাগুলিতে যে আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহার পক্ষে কোন কাহিনীর প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব কবিতার আদর্শ শাক্তকবিদের সম্মুখে বিদ্যমান ছিল। ক্ষুদ্রাকৃতি বৈষ্ণব কবিতাসমূহে কবিরা যেভাবে তাঁহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন শাক্ত কবিদের উপর তাহার প্রভাব অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল। ফলে শাক্ত কবিদের আত্মনিবেদনের সুর মূল কাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গীতি-কবিতার আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শুধু যে বাস্তব অবস্থা হইতে পরিত্রাণের কাতর নিবেদনই শাক্ত পদাবলীতে রূপায়িত হইয়াছে এমন মনে করিবার কারণ নাই। ইহা শাক্ত পদাবলীর একটি দিক মাত্র। শক্তি সাধনার বিচিত্ররূপ, উপাস্যা দেবীর আকৃতি ও প্রকৃতি, তৎকালীন পারিবারিক জীবনালেখ্য এবং ঐ যুগের সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবিও শাক্ত পদাবলীতে রূপলাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে যে নিঃস্বার্থ ভক্তিরসের প্রকাশ ঘটিয়াছিল শাক্ত পদাবলীতেও তাহা পরিবেশিত হইয়াছে এবং পরিণামে বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম পরিণতি লাভ করিয়াছে।

শাক্ত পদাবলীতে যে মাতৃশক্তির বন্দনা করা হইয়াছে তিনি ভীষণা, রক্তাম্বরা দেবী। তিনি শ্মশানচারিণী এবং নৃমুণ্ডমালিনী—

বিষমোজ্জ্বল জ্বালা বিভাসিত কপাল,
খল খল করালহাসিনী।
সদ্যচ্ছেদিত নরমুণ্ডশোভিত কর,
ঘোর গভীর কাদম্বিনী-বরণী, ভীমা ভুবনত্রাসিনী।
অতি বিশাল বদনমণ্ডল—
লক্ লক্ রুধির-লোলুপ-রসনা,
রুধির-ধার-স্রুত বিপুল দশনা,
অস্থিচর্মসার, কঙ্কাল-হার—
বিভূষিত দিক্‌বসনা-ব্যোমগ্রাসিনী।

তন্ত্রোক্ত এই দেবীর বীভৎস রূপ কল্পনার পশ্চাতে তত্ত্বগত কারণ অবশ্যই আছে কিন্তু দেশের তদানীন্তন ভয়াবহ অবস্থাও যে এই দেবীকে বন্দনা করিবার প্রেরণা দিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শাক্ত পদাবলীতে সমাজ জীবনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বৈষ্ণব পদাবলীকে সমাজ জীবনের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্ক রহিত বলা চলে। ইহাতে কল্পলোকের প্রেমমধুরতা বাস্তবজীবনের কুশ্রীতাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে দৈনন্দিন জীবনের শুধুমাত্র সেই সকল দিকই গ্রহণ করা হইয়াছে যাহার আধারে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ফুটাইয়া তোলা সম্ভব। শাক্ত পদাবলীতে অত্যন্ত নগ্নভাবে সাংসারিক জীবনের দীনতা, কুশ্রীতা রূপলাভ করিয়াছে। ইহাতে অধ্যাত্ম-সাধনার দিকটিও তন্ত্রোক্ত প্রথাকে বিন্দুমাত্র লঙ্ঘন না করিয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও তত্ত্বকেই রসভাষ্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তবুও তাহাতে কবি-কল্পনার প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে। কারণ বৈষ্ণব পদাবলীর স্থায়ীভাব হইতেছে রতি এবং

স্থায়ী রস হইতেছে শৃঙ্গার। অবশ্য বাৎসল্য রসের পদও বৈষ্ণব পদাবলীতে রহিয়াছে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে শাক্ত পদাবলীর যে অংশ বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে বাৎসল্য রসের দ্বারা (বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়া) প্রভাবান্বিত হইয়াছে তাহাতে কবি-কল্পনা বিশেষ স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু যে সব অংশে উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে তাহাতে কবিকল্পনার বিশেষ কোন অবকাশ ছিল না। শাক্ত পদাবলীতে বহির্জীবনের প্রকাশ সমধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, বৈষ্ণব পদাবলীতে অন্তর্জীবনের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু শাক্ত পদাবলীতেও অন্যভাবে অন্তর্জীবনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুসমাজ বিশেষভাবে শাস্ত্রবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'শাস্ত্রবিধি শাসিত, স্মৃতিব্যবস্থা-প্রভাবিত সমাজ ও পরিবারে পরকীয়া তত্ত্বের অসামাজিক হৃদয়বৃত্তি যে বিশেষ প্রশ্রয় পাইবে না ইহা স্বাভাবিক ; রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার দৃষ্টান্তে সমাজের বুকে অবৈধ প্রণয়াভিনয় সমাজ-চেতনায় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে বিধিবদ্ধ, কঠোরনীতি-নিয়ন্ত্রিত সমাজে মাতার প্রভাব বাড়িতে লাগিল ও ধীরে ধীরে মাতা প্রেয়সীকে স্থানচ্যুত করিয়া পরিবার-জীবনের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। জননীর এই প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিবার ও সমাজ হইতে স্বভাবতই অধ্যাত্মজীবনে সম্প্রসারিত হইল। "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর"—বৈষ্ণব ধর্মের এই উন্নত অধ্যাত্মতত্ত্ব বাঙ্গলার বাস্তব জীবনে এক অপরিচিত অনুভূতি-লোকের বার্তা বহন করিয়া আনিল এবং প্রাকৃত গণচেতনার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক একটি ভাববিলাসরূপে প্রতিভাত হইল। পক্ষান্তরে, মাতা ও সন্তানের মধ্যে স্নেহ-ভক্তি-মমতা, পারস্পরিক আদর-আবদার, মান-অভিমান প্রাত্যহিক জীবনে এমন একটা উজ্জ্বল সত্য ও সার্বভৌম অভিজ্ঞতা যে অধ্যাত্মজীবনে এই সুর স্বতই ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কাজেই বাংলা গীতি-কবিতা মাতার জয়গানে, মাতার

প্রতি একান্ত আত্মনিবেদনে, দুরন্ত শিশুর স্নেহানুযোগে প্রতিদিনকার গার্হস্থ্যজীবনের শত কল-কাকলীতে মুখর হইয়া উঠিল।') (বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

২

শাক্ত পদাবলীর বিষয়বস্তুকে মোটামুটী এই কয়টি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(ক) উপাস্যা দেবীর রূপ। তন্ত্রে এই দেবীর যে রূপবর্ণনা রহিয়াছে শাক্ত পদাবলীতে তাহার অবিকল রূপালেখ্য দেখিতে পাই। যেমন,—

এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না ভালে শোভে বাল-শশী।
যোগিনীদল-সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী,
হেরিয়া রণরঙ্গিনী, মনে বড় ভয় বাসি।

এখানে দেবী কালীরূপে প্রতিভাত।

(খ) শক্তিকে যখন কন্যারূপে কল্পনা করা হইয়াছে তখন ইনি গিরিরাজদুহিতা উমারূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়ার পদে এই দেবীরই লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল পদে বাঙ্গালীর পারিবারিক আলেখ্য অতি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে এবং তৎকালীন সমাজ জীবনের চিত্রও এই সকল পদে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাৎসল্য রসই এই সকল পদের মূল রস। যেমন,—

(১) আর জাগাস্ নে মা জয়া, অবোধ অভয়া,
কত করে' উমা এই ঘুমাল।
মা জাগিলে একবার, ঘুমপাড়ানো ভার—
মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল।

(২) বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ;
হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার,
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।

(গ) দেবীর উপাসনা বিধি। ইহাতে তান্ত্রিক উপাসনা পদ্ধতিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করা হইয়াছে। যেমন,—

আমার মনে বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে, হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী॥
মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে চারি পত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্ধ ত্রিবলয়াকারে শিরে ঘেরে কুণ্ডলিনী॥

(ঘ) মায়ের নিকট ভক্তের আবেদন। এই পদগুলিও উপাসনা বিধির অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। পদগুলিতে ভক্তহৃদয়ের আকূতি বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন,—

সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা-খেলা;
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা।
কত ছাই-মাটি দেখ্ গায় ভরেছে, গা দিয়ে ঘাম ছুটেছে,
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পুঁছে দে মা গায়ের মলা।

এই শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, জননীর রূপবর্ণনা এবং বিশেষ করিয়া জননীর কন্যারূপে লীলার মধ্যেই কবিকল্পনা বিকশিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। দেবীর উপাসনাবিধি ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, মূলাধার, সহস্রার প্রভৃতি গূঢ়ার্থমূলক শব্দদ্বারা এত অধিক কণ্টকিত যে, তাহার মধ্য হইতে কাব্যরস আহরণ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। এই কবিতাগুলি আমাদিগকে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের গোপন সাধনপ্রণালীসম্বলিত চর্যাপদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

৩

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা শাক্ত পদাবলীকে অনেকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা গেলেও সাধারণভাবে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—(ক) উমাসঙ্গীত (খ) কালীকীর্তন। উমাসঙ্গীত অনেকটা বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত। বাৎসল্যরসই এই পদগুলিকে আমাদের নিকট এত আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। বালিকা কন্যার বিবাহের সময় পিতামাতার মনের গভীর বেদনাবোধ, দরিদ্র গৃহস্থালীর চিত্র, পর করিয়া দেওয়া কন্যাকে দেখিবার জন্য মাতার আকুলতা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে উমাসঙ্গীত এই যুগেও আমাদের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়া তোলে। উমাসঙ্গীতে জগজ্জননীর লীলা বর্ণিত হইলেও এই পদগুলি যুগপৎ লীলাপ্রধান এবং তত্ত্বপ্রধান। মা মেনকা যাঁহাকে এতকাল কন্যা বলিয়া জানিয়াছিলেন অকস্মাৎ তিনি দেখিলেন—

কে রণ-রঙ্গিনী।
কে নারী অঙ্গনে এলো, চিনিতে না পারি।
অঙ্গনে দাঁড়াইয়ে—এ নয় আমার প্রাণকুমারী।
দশ দিক্ দীপ্ত করা, এ রমণী দশ-করা,
বিবিধ আয়ুধ-ধরা, দনুজ-দলনী হেরি।
(নহে মম কন্যে এ যে, এ সমর-সাজে সাজে,)
মানসে অমর পূজে এ নারী-চরণ, গিরি।
কি সুরী অসুরী হবে, দানবী মানবী কিবে—
(যদি আমার উমা হবে, তবে কেন ভয়ঙ্করী!)

তবুও এই তত্ত্বের আড়ালে অপত্য-স্নেহের যে প্রস্রবণ প্রবাহিত হয় তাহার ধারায় আমরা অনায়াসেই অবগাহন করিতে পারি।

কালীকীর্তনে অর্থাৎ উপাস্যা দেবীর আকৃতি-প্রকৃতি এবং উপাসনা-তত্ত্বের বর্ণনাংশ মুখ্যতঃ তত্ত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে

কাব্যরসকে আমরা অতি সহজে হৃদয়ে প্রবেশ করাইতে পারি না। কাব্যরস তো দূরের কথা তান্ত্রিক মতবাদ তথা কালীতত্ত্ব (১) সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকিলে এই পদগুলির অর্থগ্রহণ করাই সম্ভবপর নহে। অবশ্য একথা ঠিক যে, ভক্তহৃদয়ের আর্তি স্বার্থসম্পর্করহিত হইয়া অতি মনোহর ভঙ্গীতে ঐ সকল পদে বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু মুহুর্মুহু এমন সমস্ত দুর্বোধ্য রূপক ও গূঢ়ার্থমূলক শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে যাহা গীতিকবিতা পাঠ করিবার সময় মনে যে-একটা স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আসে তাহাকে রুদ্ধ করিয়া দেয়।

শাক্ত পদাবলী সার্থক গীতিকবিতা কিনা এই সম্পর্কে মতভেদ আছে। গীতি-কবিতার অর্থ গান ও কবিতার সংমিশ্রণ। ইংরেজী সাহিত্যে গীতি-কবিতাকে বলা হয় Lyric. সঙ্গীতমূলক এই কবিতাগুলি বীণা-যন্ত্রের সহযোগে গীত হইত বলিয়াই ইহাদের নাম হইয়াছে Lyric বা গীতি-কবিতা। কিন্তু আধুনিক কাব্যে গীতি-কবিতার যে-রূপটি দেখা যায় তাহাতে তাহাকে সঙ্গীতের সঙ্গে এক সারিতে বসাইলে ভুল করা হইবে। ইহাদের মধ্যে গীত ও কবিতার অর্থাৎ সঙ্গীত ও গীতি-কবিতার পার্থক্যটি বিশেষ সুপরিস্ফুট। আধুনিক গীতি-কবিতার মধ্যে সঙ্গীত-ধর্মিতা থাকিলেও ইহা নিছক সঙ্গীত নহে। কারণ শব্দচয়ন ব্যাপারে সঙ্গীত-রচয়িতার হাত পা বাঁধা। সুরের প্রয়োজনে তাঁহাকে শব্দ নির্বাচন করিতে হয়। যে সকল শব্দ সুরাত্মক এবং অতি সহজে উচ্চার্য, সঙ্গীত-রচয়িতা সেইগুলিকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া সঙ্গীতে ভাবের বৈচিত্র্য থাকে না। একটি সঙ্গীতে একাধিক ভাবকল্পনা অসম্ভব। পক্ষান্তরে গীতি-কবিতায় ভাবের বৈচিত্র্য থাকায় কোন বাধা নাই এবং তাহাতে শব্দচয়ন ব্যাপারে কবির পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে।

(১) পরবর্তী অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

গীতি-কবিতায় কবিহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস সাবলীল ধারায় প্রকাশিত হয়। সাধারণতঃ কোন তত্ত্ব গীতি-কবিতার মুখ্য বিষয় হইতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে শাক্ত-পদাবলীকে সার্থক গীতি-কবিতার পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া চলে না। কারণ শাক্ত পদাবলীতে তত্ত্বের দিকটি বেশ সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তদুপরি সুরে সমর্পিত না হইলে শাক্ত পদাবলীর মাধুর্য ও আবেদন একেবারেই অনুপস্থিত থাকিবে। রামপ্রসাদের বিষাদ-করুণ সুরটি যখন শাক্ত পদাবলীতে সমর্পিত হয় তখন মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মন ঐ সঙ্গীতের সহিত অলৌকিকের পথে যাত্রা করে।

তবুও আমরা শাক্ত পদাবলীকে গীতি-কবিতাই বলিব। বৈষ্ণব পদকর্তাগণের যেমন বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকে উপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না শাক্ত পদাবলীর ক্ষেত্রে সেইরূপ কোন বিধিনিষেধ ছিল না। যদিও উপাস্য তত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্ব শাক্ত-কবিদের মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তবুও তাঁহাদের স্বাধীনতা ইহাদের দ্বারা সর্বাংশে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আত্মগত হইয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশে তাঁহাদের কোন বাধা ছিল না এবং শাক্ত পদাবলীতে স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ের আবেগ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। কাজেই গীতি-কবিতারূপে শাক্ত পদাবলীর প্রতিষ্ঠাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

শাক্ত পদাবলী নিঃসন্দেহে ধর্মমূলক কবিতা। কিন্তু ধর্ম উপলব্ধির বিষয় এবং এইজন্যই ইহা কাব্যের বিষয়ীভূত হইতে পারিয়াছে। তান্ত্রিক সাধকদের মতে কুণ্ডলিনীই অর্থাৎ শক্তিই হইতেছেন কাব্যাদির মূল উৎস। নিজদেহে এই কুণ্ডলিনীকে যে সাধক জাগ্রত করাইতে সক্ষম হন তিনি কবিত্বশক্তির অধিকারী হইয়া উঠিবেন ইহাতে আর সন্দেহ কি?

তান্ত্রিক সাধকবর্গ তথা শাক্তপদকারগণ কেহই সংসার-উদাসী বৈরাগী ছিলেন না। তাঁহাদের সাধনাও রিক্ত বৈরাগ্যের সাধনা নয়।

কাজেই সাংসারিক ও সামাজিক সুখ-দুঃখ সম্পর্কে তাঁহারা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এইজন্যই শাক্ত পদাবলীতে সমাজ ও পরিবার জীবন অতি সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। উহাতে যে সব রূপক ব্যবহার করা হইয়াছে সেইগুলিতে তৎকালীন সমাজ জীবনের প্রতিফলন স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করা যায়। পেয়াদা-পাইক বরকন্দাজ, সমন ও ডিক্রিজারী, কলুর ঘানি, পাশা-খেলা, ঘুড়ি-ওড়ানো, কৃষি-কাজ, অনাবাদী জমি, শিকারী পাখী ইত্যাদির রূপকে কবিদের সমাজ-সচেতনতা বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। শাক্ত পদাবলীর চিত্রকল্পতাও ইহার কাব্যমূল্যকে যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে। যেমন—

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো ॥

কাজেই স্বার্থবুদ্ধিহীন আত্মনিবেদনের সুর, সঙ্গীতের মধুর রেশ, পারিবারিক আলেখ্য, নিপীড়িত জনগণের বেদনা প্রভৃতি উপাদান মিলিয়া শাক্ত পদাবলীকে অপূর্ব জীবনরসাশ্রয়ী কাব্যে পরিণত করিয়াছে। অবশ্য শাক্ত পদাবলীর একঘেঁয়েমি সময় সময় বড়ই বিরক্তিকর বলিয়া মনে হয়। সন্তানের অতিরিক্ত আবদারে স্নেহময়ী মাতাও যেমন অনেক সময় বিরক্ত হইয়া পড়েন, তেমনি একই তত্ত্বের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ মন ও শ্রুতির উপর নিতান্ত পীড়াদায়ক মনে হয়। 'কেবল উপমা, অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের ঘটা, শব্দের চাতুর্য এবং তত্ত্বের কচকচি তাহাকে এমনি ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে যে, আপাদমস্তক গহনামণ্ডিত দেহের মত, তাহার গড়ন যে কেমন, সৌন্দর্য যে কেমন, তাহা বুঝিবার জো নাই।' ধর্মসঙ্গীত সম্পর্কে অজিত চক্রবর্তীর এই অভিমত কতকাংশে শাক্ত পদাবলী সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

শাক্ত পদাবলীতে ভাষাপ্রয়োগেও কবিদের জীবনাভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্য আমরা প্রায়শঃ যে সব

চলতি কথা ও প্রবাদ ব্যবহার করি—'ভূতের বোঝা', 'বেগার খাটা', 'চোখের ঠুলি', 'কলুর বলদ', 'বন্ধ্যার প্রসব ব্যথা'—শাক্ত গীতিকারগণ বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের সেই মৌখিক ভাষাই তাঁহাদের পদে ব্যবহার করিয়াছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর মত শাক্ত পদাবলীকেও শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইলে তাহাদের মধ্যে একটা নাটকীয় গতির সঞ্চার লক্ষ্য করা যায়। যাত্রা ও পাঁচালিকারগণ এই সঙ্গীতগুলিকে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক সংলাপের ভঙ্গীতে সাজাইয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগমনী ও বিজয়ার গানগুলিই এইদিক দিয়া সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

ভারতীয় সাধনার ধারা ও শক্তিপূজা

ঈশ্বরোপাসনার এত বিচিত্র পদ্ধতি ভারতবর্ষের মত পৃথিবীর আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে এক সত্তা রহিয়াছেন যিনি জীব ও জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সত্তার স্বরূপ কি, তাঁহাকে কিভাবে অন্তরে উপলব্ধি করা যায়, কিভাবে তিনি জীবের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ হইয়া রহিয়াছেন, জীবের জন্মই বা কি কারণে হয়, মৃত্যুর পরই বা জীব কোথায় যায় ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের মনে জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। ভারতীয় দর্শনে এইসব প্রশ্ন সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা রহিয়াছে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বের অবস্থাটা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। সেই অনন্ত অসীম মহাশূন্য মহাব্যোম আমাদের কল্পনা-শক্তির গোচরে আসে না। ঐ মহাশূন্য অনন্ত অসীমকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। সেই অসীম নির্বিকার, নির্বিশেষ এবং নির্বিকল্প। মানুষ

তাঁহাকে কল্পনায় আনিতে পারে না। ইনি অদ্বয়। ইঁহাকেই লাভ করিতে হইবে। এই অসীমের উপলব্ধি কি করিয়া হইতে পারে, অসীম সীমার বন্ধনে ধরা দিয়াছেন কিনা অর্থাৎ ব্রহ্ম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীব সৃষ্টি করিয়াছেন কিনা ইহাও ভারতীয় দর্শনের প্রধান বিতর্কের বস্তু। বেদান্তের মতে অনন্ত শূন্যরূপী ব্রহ্মই সব আর এই জগৎ মায়া মাত্র। ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা এই জগৎকে প্রত্যক্ষ করি। যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখা যায় তবে এই জগতের অস্তিত্ব লোপ পাইবে, শুধু থাকিবে সদা জাগ্রত চৈতন্য। এই চৈতন্যই ব্রহ্ম, অর্থাৎ জীব মায়ামুক্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্ম হইয়া যাইতে পারে। ব্রহ্ম সম্পর্কে এই মতবাদ সকলে গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জীব ব্রহ্মের অংশ বটে তবে জীব পরিণামে ব্রহ্ম হইয়া যাইতে পারে না। এই ব্রহ্মের ব্যাখ্যা নানাজনে নানাভাবে করিয়াছেন।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম-মৃত্যুর, সৃষ্টি-প্রলয়ের রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া মানুষ সমস্ত কিছুর পশ্চাতে এক সর্বশক্তিমান সত্তা রহিয়াছেন বলিয়া কল্পনা করে। প্রকৃতির মধ্য দিয়া এই সর্বশক্তিমানের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সে বহুরূপে আরাধনা করিতে আরম্ভ করে। বহুরূপ যে তাঁহার এক ও অদ্বিতীয় সত্তার বিচিত্র প্রকাশ এই সত্যটি পরে স্থিরীকৃত হয়। সর্বশক্তিমানের বিচিত্র প্রকাশের এক একটি দিককে কেন্দ্র করিয়া এক একজন দেবতা পরিকল্পিত হয়। ঐ দেবতাদের সাধন পদ্ধতিও বিচিত্র। ঋগ্বেদ হিন্দুদের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। ঋগ্বেদে পুরুষ দেবতাদেরই একছত্র আধিপত্য। স্ত্রী-দেবতা অথবা শক্তির উদ্ভব কি করিয়া হইল তাহা লইয়া গবেষণার অন্ত নাই।

শক্তি-তত্ত্বের উৎস ঃ পরমব্রহ্মের অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ভগবানের 'শক্তি' কল্পনা ভারতীয় দর্শনের একটি বিশেষ অবদান। সর্বশক্তিমান যাহা কিছু করিতেছেন তাহার মূলে রহিয়াছে তাঁহারই এক সর্বব্যাপিনী

শক্তি। এই শক্তিই সর্বক্রিয়া এবং সর্বজ্ঞানের মূল কারণ। এই শক্তিই দেবীরূপে বন্দিতা। মূলতঃ শক্তিমান (ব্রহ্ম বা ভগবান) ও তাঁহার শক্তি অভেদ। এই অভেদত্ব ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত হইলেও শক্তিকে শক্তিমান হইতে পৃথক করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্তন ভারতীয় শক্তিবাদের মূলতত্ত্ব। এই শক্তিবাদই ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করিবার প্রেরণা দিয়াছে।

ভারতবর্ষের এই শক্তিবাদ বৈদিক কিনা তাহা লইয়া প্রভূত বিতর্ক রহিয়াছে। অনেকের অনুমান এই যে, মাতৃতান্ত্রিক অনার্য সম্প্রদায় হইতে আর্য সমাজে শক্তিবাদের পরিকল্পনাটি আসিয়াছে। বেদে স্ত্রী-দেবতার স্থান অত্যন্ত নগণ্য, উহাতে পুরুষ-দেবতাদের প্রাধান্য অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫০ সূক্তটিতে যে দেবীবন্দনা রহিয়াছে তাহাকে অবলম্বন করিয়া একদল পণ্ডিত এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, ঋগ্বেদের এই দেবী-সূক্তই ভারতীয় শক্তিবাদের মূল উৎস। কিন্তু বেদে পুরুষ-দেবতাদের তুলনায় স্ত্রী-দেবতারা এত নগণ্য যে, যাহাতে উক্ত অভিমত সকলে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অন্যদিকে দেখিতে পাওয়া যায় ভারতের আর্যেতর অধিবাসীদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া পার্বত্য বনপ্রদেশের অধিবাসীগণের মধ্যে দেবীপূজার সবিশেষ প্রচলন ছিল। দেবীপূজার উদ্ভব ও প্রচলন আর্যেতর আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রথমে সীমাবদ্ধ থাকিলেও ইহাতে পরে আর্যরাই উন্নততর দার্শনিক তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার আরোপ করিয়াছেন। এইভাবে আর্য-অনার্যের মিশ্রণের ফলেই হিন্দুধর্মের উদ্ভব হইয়াছে। যে-ধর্মকে বর্তমান আমরা 'হিন্দুধর্ম' নামে অভিহিত করি তাহা নিঃসন্দেহে একটি জটিল মিশ্রধর্ম।

শক্তিপূজার প্রধান ধারক হইল শাক্তগণ বা শৈবগণ। শিব ও শক্তির লিত রূপই মানবের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে। শিব হইতেছেন সেই

আদি সত্য অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ভগবান। শক্তি হইতেছেন শিবের শক্তি। শিবযুক্তা শক্তিই বিশ্বসৃষ্টির মূলে রহিয়াছেন। কাজেই উভয়ের সম্মিলিত-রূপই হইলেন পরমার্থ এবং জীব তাঁহাকেই একমাত্র কামনা করিয়া থাকে। শিব ও শক্তির পূজকগণকে শৈব বা শাক্ত বলা হইয়া থাকে।

শক্তিপূজার প্রধান ধারক শাক্ত বা শৈব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা হইলেও ইহার প্রভাব বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন, নাথপন্থী, বাউল প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের উপরই পরিলক্ষিত হয়। শাক্তরা যে-সৃষ্টিতত্ত্বের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে আদিদেবে পিতৃত্ব এবং আদিদেবীতে মাতৃত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই আদিদেব ও আদিদেবী শিব ও পার্বতীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। এই পার্বতীই আবার চণ্ডী, দুর্গা, কালী, চামুণ্ডা প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্তিতে পরিকল্পিত হইয়াছেন। তেমনি শিবেরও বিভিন্ন রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। ভারতীয় কল্পনায় বহু পুরুষ-দেবতা এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই শক্তি হিসাবে এক একজন স্ত্রী-দেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছে—যেমন বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, বিষ্ণু যখন রাম তখন তাঁহার শক্তি সীতা, আবার ঐ বিষ্ণুই যখন কৃষ্ণ তখন তাঁহার শক্তি রাধা। কিন্তু সকল দেবতা এবং তাঁহাদের শক্তিবৃন্দ পরিণামে সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মে লয় পাইয়াছেন। অর্থাৎ সর্বশক্তিমানের বিচিত্র রূপ কল্পনা হইতেই বহু দেবতার উদ্ভব হইয়াছে। তেমনি সর্বশক্তিমানের 'শক্তি'ও নানা দেবীরূপে কল্পিতা হইয়াছেন। এই শক্তি কিভাবে দুর্গা ও কালী রূপে (শাক্ত পদাবলীতে যে-দেবীর ধ্যান করা হইয়াছে) রূপান্তরিত হইলেন তাহা আমরা পরে আলোচনা করিতেছি। তৎপূর্বে দেব-দেবীর বিভিন্ন রূপ-কল্পনা থাকিলেও তাঁহারা যে মূলতঃ একই সত্যের বহিঃপ্রকাশমাত্র এবং সেই সত্যকে লাভ করিবার পদ্ধতি বহুবিধ হইলেও সেই পদ্ধতিগুলি যে এক গভীর ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ তাহার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

বহু বিচিত্র ভারতীয় সাধনার ধারা ও তাহাদের ঐক্য— আমরা সকলেই অনাদি ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়া এই জগতে আসিয়াছি। ব্রহ্মই আমাদের স্বরূপ। এই স্বরূপে প্রত্যাবর্তন, এবং উহাকে উপলব্ধি ইহাই ভারতীয় সাধনার মূলকথা, ইহাই সত্য-দর্শন। ভারতবর্ষের এই সত্য-দর্শনের জন্য যে সকল সাধন পদ্ধতির প্রচলন আছে তাহা বহু বিচিত্র। কিন্তু এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সকলের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। এই সত্যটি হইতেছে আমাদের স্বরূপে প্রত্যাবর্তন। 'স্বরূপোপলব্ধি বা সত্যদর্শনের পথ তাই সর্বত্রই ফিরিয়া চলিবার পথ। এইখানেই ভারতীয় সাধনার ঐক্য। সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সম্প্রদায়ই যে মত প্রকাশ করুক না কেন, সত্য লাভ সম্বন্ধে সকলের মত, আমাদের ব্যবহারিক জীবনের পরিচিত পথ হইতে আমাদিগকে ফিরিয়া চলিতে হইবে উল্টা পথে—রূপ হইতে স্বরূপে। অনেক সাধক-সম্প্রদায় এই সাধনার নাম দিয়াছেন উল্টা-সাধনা। উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে এই উল্টা-সাধন নামটির অনুরূপ শব্দ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতির প্রচারিত সাধনার রহস্যে প্রবেশ করিলেই দেখা যাইবে, তত্ত্বতঃ মধ্যযুগের ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির সাধন পদ্ধতির সহিত উপনিষদ্, গীতা, যোগশাস্ত্র প্রভৃতির কোন বিরোধ ত নাই-ই বরং গভীর ঐক্য রহিয়াছে। (ভারতীয় সাধনার ঐক্য— ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।) উপনিষদের, গীতার, বেদান্তের, বৈষ্ণবের, তন্ত্রের, সহজিয়াদের, নাথযোগী, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধনার ভিতরেও এই ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। 'অধ্যাত্ম-সাধন সর্বদাই উল্টা-সাধন,—বাহিরের দিক হইতে ভিতরের দিকে ফিরিয়া তাকান,—বাহিরের দেশ হইতে অন্তরের দেশে ফিরিয়া যাওয়া। এই যে আমাদের জীবনের যাত্রা অমৃতের দেশে অমৃত-স্বরূপ হইতেই তাহার আরম্ভ,—পথ চলিতে চলিতে হয়ত সেই স্বরূপ হইতে অনেকখানি

দূরে আসিয়া সরিয়া পড়িয়াছি—সেই অমৃত-স্বরূপকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি—আর সেই অমৃত-স্বরূপকে বিস্মৃত হওয়ার অর্থ-ই মৃত্যুর হাতে পড়িয়া নিরন্তর লাঞ্ছনা ভোগ করা। এই চলার পথে একবার 'আবৃতচক্ষুঃ' হইতে হইবে—তারপরে উল্টা পথে ফিরিয়া যাইতে হইবে দেহ হইতে আত্মায়—স্থূল হইতে সূক্ষ্মে—মৃত্যু হইতে অমৃতে; ইহাকেই বলে উল্টা-সাধন। সাধকগণ ইহাকে উজান-সাধনও বলিয়াছেন; সংসারের যেদিকে চলিতেছে স্বাভাবিক ক্ষর-স্রোত সে দিক হইতে উজাইয়া চলিতে হইবে অক্ষরের পথে,—সে পথে চলিতে চলিতে একদিন লাভ হইবে যে সত্য সে ক্ষরও নয়, অক্ষরও নয়—ক্ষর—অক্ষর উভয়ের ঊর্ধ্বে, তিনিই পুরুষোত্তম—তিনিই অমৃতত্ব।' (ঐ)

তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা—এই উল্টা-সাধনের বিভিন্ন প্রণালী বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছে। তবে ঐ প্রণালীগুলি মোটামুটি তান্ত্রিক সাধন-প্রণালীরই রকমফের মাত্র। কাজেই এই তন্ত্র বা তান্ত্রিক সাধন-প্রণালীর স্বরূপ কি তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

'তন্ত্র' কথাটির আভিধানিক অর্থ হইতেছে পন্থা, মত, বাদ বা বিধি—যেমন গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু ভারতীয় উপাসনার ক্ষেত্রে তন্ত্রের একটি বিশিষ্ট অর্থ রহিয়াছে। শিব ও শক্তি সম্বন্ধীয় শাস্ত্র বা উপাসনা বিধিকেই তন্ত্র বলা হইয়া থাকে। ইহাকে আগম-শাস্ত্র—বেদের শাখা বিশেষ, বলা হইয়া থাকে। তান্ত্রিক উপাসনা পদ্ধতি কোন যুগ হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে তাহা নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। অতি প্রাচীনকাল হইতে দ্রাবিড় ইত্যাদি জাতিদের মধ্যে তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচার প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। অনেকের ধারণা আর্যগণ উহা গ্রহণ করিয়া নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন। তান্ত্রিকরা অবশ্য মনে করেন যে, সমস্ত তন্ত্রানুষ্ঠানই বৈদিক এবং বেদ হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

তান্ত্রিক মতবাদের কোন দার্শনিক ভিত্তি আছে কিনা এই নিয়া যথেষ্ট বিতর্ক রহিয়াছে। তান্ত্রিক সাধন-প্রণালীর স্বরূপ কি এবং উহার কোন দার্শনিক ভিত্তি আছে কিনা এই সম্পর্কে সুপণ্ডিত ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল —

'তন্ত্র মূলতঃ কোনও দার্শনিক মতবাদ নহে; নানা দর্শনশাস্ত্রে পরমার্থ সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে নানাভাবে যত আলোচনা হইয়াছে, সেই আলোচিত সত্যকে লাভ করিবার কার্যকরী পন্থা সম্বন্ধে তত কথা বলা হয় নাই। তন্ত্রের আসল কথাই সত্যকে উপলব্ধি করিবার পন্থা—অর্থাৎ সাধনপ্রণালী। দার্শনিক মত হিসাবে তন্ত্র ভারতীয় অদ্বয়বাদেরই সমর্থক; কিন্তু এই অদ্বয়-সত্যকে লাভ করা যায় কি করিয়া তাহাই তন্ত্রের মুখ্য আলোচ্য।

তন্ত্রমতে অদ্বয়-সত্যের দুই রূপ; এক রূপ গুণাতীত নিবৃত্তি স্বরূপ,—এইরূপই চিন্মাত্রতনু শিব ও অপর রূপ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি—তিনি প্রবৃত্তি-স্বরূপিনী,—সংসার প্রপঞ্চের কারণভূতা। এই শিব বা শক্তি কেহই অন্যোন্য নিরপেক্ষ নহেন; পরম অদ্বয় স্বরূপে এই উভয়ে থাকেন এক হইয়া—ইহাই শিবশক্তির মিথুনরূপ। এই শিব-শক্তি মিলিতাবস্থাই পরমার্থ,—ইহাই জীবের একমাত্র কাম্য। শিবযুক্তা শক্তিই বিশ্বসৃষ্টি-প্রবাহের কর্ত্রী এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবী; কিন্তু শিব ব্যতীত শক্তির কোনও শক্তি নাই—সুতরাং কোন অস্তিত্বই নাই—আবার শক্তি-বিবর্জিতরূপে 'শিবোঽপি শবতাং যাতি'—শিবও শব হইয়া যান।

সমগ্র বিশ্বসংসারে প্রকাশিত শক্তির খেলা—সংসার চলিয়াছে শুধু প্রবৃত্তির পথে—সামনের দিকে, নিরন্তর পরিবর্তনের ভিতর দিয়া শুধু 'হওয়া'র পথে। এই সংসারের সুরে মিলাইয়া মানুষও চলিয়াছে শুধু প্রবৃত্তির পথে—পরিবর্তনের পথে। সংস্কারের ঊর্ধ্বে অবস্থিত নির্গুণ নিষ্কল শিবের সহিত প্রবৃত্তির পথে ধাবমানা এই শক্তির মিলন

করাইতে হইবে; সেই মিলনের দ্বারা যে সত্য দর্শন হইবে সে সত্য প্রবৃত্তিও নয়, নিবৃত্তি নয়,—তাহা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয়ের ঊর্ধ্বে।

এই শিব-শক্তির মিলন ঘটাইবার উপায় কি? এইখানেই আসে তান্ত্রিক সাধন-প্রণালীর কথা। তান্ত্রিকগণ বলেন, সকল সত্য আমাদের ভিতরে—শুধু অন্তরে নয়—আমাদের দেহের ভিতরেও। যে সত্য বিরাজিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিপুল প্রবাহের ভিতরে সেই সত্যই বিরাজিত আমাদের দেহের ভিতরে—সমগ্র জৈবিক প্রবাহের ভিতরে, সমস্ত জৈবিক প্রবাহ লইয়া আমাদের এই দেহটিই আবহমান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্তি। এই দেহের ভিতরেই রহিয়াছে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, সকল পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সংবৎসর, মাস, দিবস, তিথি, ক্ষণ। এই দেহই সত্যের মন্দির, সকল তত্ত্বের বাহন; ইহাকেই যন্ত্র করিয়া ইহার ভিতরেই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ইহার ভিতরেই শিব-শক্তির মিলন ঘটাইতে হইবে। নিজের ভিতরে এই শিব-শক্তির মিলনের দ্বারা সত্য-প্রতিষ্ঠা হইলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়াও সেই সত্যকে উপলব্ধি করা সহজ হইবে। সাধককে তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে দেহ-ভাণ্ডে, ইহাই তান্ত্রিক সাধনার প্রথম অঙ্গ।

তান্ত্রিক মতে দেহের ভিতরকার মেরুদণ্ডটিই মেরুপর্বতের ন্যায় দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছে। এই মেরুদণ্ডের একটি কুমেরু বা দক্ষিণমেরু এবং একটি সুমেরু বা উত্তরমেরু রহিয়াছে, সর্বনিম্নে অবস্থিত মূলাধার চক্রই দক্ষিণমেরু, এবং সর্বোর্ধ্ব 'সহস্রার'ই উত্তরমেরু বলিয়া কল্পিত হইতে পারে। দেহের ভিতরে শক্তির অবস্থান এই মূলাধারে; সার্ধ-ত্রিবলিত কুণ্ডলীর ভিতরে তিনি কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে নিদ্রিত। সহস্রারই পরম শিবের আলয়। এই মূলাধার এবং সহস্রারের ভিতরে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা নামে পাঁচটি চক্র বা পদ্ম রহিয়াছে; সহস্রারের নিম্নের ছয়টি চক্রই

প্রসিদ্ধ ষট্‌চক্র। তান্ত্রিক সাধনার মূল কথা, সর্বনিম্নের মূলাধারে অবস্থিত নিদ্রিতা শক্তিকে প্রথমতঃ জাগ্রত করিতে হইবে; সেই জাগ্রত শক্তিকে উর্ধ্বগা করিতে হইবে। মূলাধার হইতে নাভিদেশে অবস্থিত মণিপুর পর্যন্তই শক্তির রাজ্য,—ইহাই প্রবৃত্তির রাজ্য,—ইহার উর্ধ্বে নিবৃত্তির পথ। জাগ্রত শক্তিকে যৌগিক সাধনাবলে মূলাধার হইতে ক্রমে ক্রমে উর্ধ্ব চক্রে তুলিতে হইবে; শক্তির এই উর্ধ্ব হইতে উর্ধ্বতর চক্রে গমনের ফলে সাধকের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বসমূহের উপলব্ধি হইতে থাকে। যতক্ষণ শক্তি প্রবৃত্তির রাজ্যে বাস করে ততক্ষণই মানুষ পরিবর্তনশীল সংসারাবর্তে বদ্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে থাকে,—শক্তি যখন প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃত্তিমার্গগামিনী হয়, মানুষও তখন মঙ্গলের আলোক লাভ করে। এই শক্তিকে সহস্রারে অবস্থিত শিবের সহিত মিলিত করিতে পারিলেই সাধক অদ্বয়-সত্য লাভ করিতে পারে; সেই অদ্বয়ের ভিতরে ভোগ ও মুক্তি—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সবই ডুবিয়া যায়। এই নিম্নস্থা শক্তিকে উল্টামুখে উর্ধ্বগামিনী করিয়া উর্ধ্বস্থ শিবের সহিত মিলিত করাই তান্ত্রিক উল্টা-সাধনের মূলতত্ত্ব।

তান্ত্রিক সাধনের আর একটি দিক আছে; সেখানেও অবশ্য শিব-শক্তির মিলনই আসল তত্ত্ব,—তবে তাহা একটু ভিন্ন প্রকারে। তন্ত্রমতে প্রত্যেক নর-নারীর ভিতরেই শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব নিহিত থাকিলেও পুরুষে শিবতত্ত্বের প্রকাশাধিক্যে এবং নারীতে শক্তিতত্ত্বের প্রকাশাধিক্যে পুরুষ শিববিগ্রহ এবং নারী শক্তি বিগ্রহ। অদ্বয়-সত্যের দুই রূপ এইভাবে ব্যবহারিক জগতে পুরুষ এবং নারীর ভিতরে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই আমরা দেখিতে পাই, আদির এক যতক্ষণ এক ছিলেন ততক্ষণ তিনি রমণ করিতে পারেন নাই, রমণেচ্ছায় তিনি নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া নারী ও পুরুষরূপে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন।

মোটের উপর তন্ত্র-সাধনায় প্রত্যেক পুরুষ শিব-স্বরূপ প্রত্যেক নারী শক্তি-স্বরূপা। ব্যবহারিক জগতে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নরনারীর মিলন চলিতেছে প্রবৃত্তির পথে; সে মিলন বাহিরে এই সৃষ্টি-প্রবাহকে রক্ষা করিবারই জন্য, পরিবর্তনশীল সৃষ্টির গতিধারাকে আগাইয়া দিবারই জন্য। কিন্তু সাধক যাঁহারা তাঁহারা এই ব্যবহারিক স্থূলরূপেই ভুলিয়া থাকেন না, ফিরিয়া তাকান; সেই অন্তর্দৃষ্টিতে অনুভব করিতে হয় স্থূলরূপের ভিতরকার স্বরূপকে। এই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যোগের পথে যে মিলন তাহা ভোগ নহে, তাহাও পরম যোগ। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সাধক লাভ করেন তত্ত্বদৃষ্টি; সেই তত্ত্বদৃষ্টির সহিত গ্রহণ করিতে হয় যোগকে। হঠযোগের সাহায্যে সাধক সমস্ত দেহের ভিতরকার জৈবিক ধারাকেই উল্টাদিকের অভিমুখী করিয়া লন; জৈবিক ধারা প্রকৃতিতেই নিম্নগা; সেই নিম্নগা ধারাই আমাদিগকে টানিয়া চলে সংসারের বন্ধনের পথে, হঠযোগের সাহায্যে যোগী ক্ষরণমুখী জৈবিক ধারাকে আগে উজানে বহাইয়া লন; সেই উজান-ধারায় স্বরূপ-প্রতিষ্ঠিত নরনারীর যে মিলন তাহাই শিব-শক্তির মিলন,—তাহা স্থূল ভোগানন্দকে ঊর্ধ্বে টানিয়া লয় শিব-শক্তির যোগানন্দরূপে। সেই যোগানন্দই পৌঁছাইয়া দেয় অদ্বয়-সত্যে। তন্ত্রে জৈবিক প্রবাহকে এইরূপে উল্টাপথে প্রবাহিত করিবার অনেক যৌগিক প্রণালীর উল্লেখ রহিয়াছে।'

তন্ত্র সাধনার এই সকল যৌগিক প্রণালী নানা রহস্যে পরিপূর্ণ। এই সকল প্রণালীকে কেন্দ্র করিয়াই তন্ত্র সম্পর্কে নানা কুসংস্কার মানুষের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। তান্ত্রিকরা নানা বীভৎস আচরণ করিয়া থাকেন, পঞ্চ ম-কার তাঁহাদের সাধনার অঙ্গ—তান্ত্রিকদের সম্পর্কে ইহাই আমাদের ধারণা। ইহার কারণ কি?

নারীরূপিণী শক্তিকে জাগ্রত করাই তন্ত্রের মূল রহস্য। এই শক্তিকে তান্ত্রিকরা বিভিন্ন রূপে আরাধনা করেন। তন্ত্রের মূলকথা হইল কায়া-সাধন। এই সাধনপদ্ধতি অনুসারে মানুষই চরম সত্য, মানব দেহের মধ্যেই বিশ্বের যাবতীয় সত্য নিহিত রহিয়াছে। পঞ্চভূতে গঠিত মানুষের এই দেহ মৃত বা শব ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত এই দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত শক্তিকে জাগ্রতা করা না যাইতেছে ততক্ষণ এই স্থূল দেহ মৃতদেহেরই সমতুল্য। মানুষের দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিতা কিন্তু সুপ্তা শক্তিই হইতেছেন প্রাণ বা চৈতন্য। এই চৈতন্য বা কুণ্ডলাকারে সুপ্তাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া ক্রমশঃ উর্ধ্বগামী (মূলাধার হইতে সহস্রারে) করিতে হইবে। এই শক্তি জাগ্রতা হইলেই আমাদের ভৌতিক দেহ বা শব শিবে পরিণত হইবেন এবং তখনই শিব ও শক্তির পূর্ণ মিলন ঘটিবে। তখনই সাধক অপার আনন্দে নিমজ্জিত হইবেন। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি সকল প্রকার ভবযন্ত্রণা হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন।

সুপ্তা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রতা করিয়া উর্ধ্বগামী করা এবং সহস্রারে পৌঁছাইয়া দেওয়া পর্যন্ত অবস্থাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হইয়াছে। এক এক স্তরে এক এক ধরনের সাধন পদ্ধতি রহিয়াছে। (১) শাক্ত-সঙ্গীতে এই সাধনপদ্ধতির কথা নানাপ্রকার ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা দ্বারা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যেমন,—

হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা
মন-পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ওমা॥

---

(১) সাধন-তত্ত্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অথবা,

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে,
হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে,
সদা যোগী করে মনন ॥

অথবা,

ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥

কিংবা,

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা তুমি আছ গো অন্তরে,
মা আছ গো অন্তরে
এক স্থান মূলাধার, আর স্থান সহস্রার
আর স্থান চিন্তামণি পুরে।

তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির গুহ্যতত্ত্ব যাঁহাদের জানা নাই তাঁহাদের কাছে এই সব গীতের রহস্য স্পষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নারীরূপিণী শক্তির উদ্বোধনই তন্ত্র-সাধনার মূল কথা। এই শক্তিকে কেহ বা নারায়ণীরূপিণী জননীরূপে, কেহবা গৌরীরূপিণী কন্যারূপে, কেহ বা ভৈরবীরূপিণী পরনারীরূপে আবার কেহবা কল্যাণী পত্নীরূপে উদ্বুদ্ধ করিবার সাধনা করিয়া থাকেন। রামপ্রসাদ এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে স্নেহময়ী জননীরূপে কল্পনা

করিয়াছেন। 'মা, মা' বলিয়া আকুল কণ্ঠে ডাকিয়া তাঁহাকে তিনি জাগ্রতা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু রামপ্রসাদ নয়, অনেক শাক্ত কবির পদাবলীতে জননীরূপিণী ও কন্যারূপিণী শক্তিরই উদ্বোধন দেখিতে পাওয়া যায়।

যে-সব সাধক শক্তিকে ভৈরবীরূপিণী পরনারীরূপে অথবা আপন জায়ারূপে উদ্বোধনের পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নানারূপ বীভৎসতামূলক আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মদ্যাদি সেবন, যথেচ্ছ যৌনাচার প্রভৃতি এত অধিক পরিমাণে ঐ সকল সাধকদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল যে, যাহাতে জনসাধারণের মনে তান্ত্রিক সাধনার উপরই একটা বিরূপতার ভাব জন্মিয়া যায় লোকের মনে এই ধারণা জন্মিয়া গেল যে, তন্ত্রশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র বুঝি এক। তান্ত্রিকতা যে কত বীভৎস হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আমরা 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাপালিক চরিত্র দ্বারাই অনুমান করিতে পারি। কাপালিক, ক্ষপণক, দিগম্বর, বামাচারী, পশ্বাচারী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে (কুলে) তান্ত্রিকগণ বিভক্ত হইয়া পড়িলেন এবং ডাকিনীতন্ত্র, যোগিনী তন্ত্র, ভৈরবী তন্ত্র প্রভৃতি নানা শাখায় তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকাশ ঘটিল। এই সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা যে-সকল বীভৎস আচরণ করিত তাহা জানিলে সকলেরই মনে জুগুপ্সা মিশ্রিত প্রচণ্ড ভয়ের সৃষ্টি না হইয়া পারে না। কিন্তু তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির মর্ম অবগত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক ধর্মমতকেই কেন্দ্র করিয়া যেমন একদল ভ্রষ্টাচারীর সৃষ্টি হয় তান্ত্রিকতার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। যেমন শব সাধনা কথাটির তাৎপর্য এই যে, মানুষের এই দেহই শবরূপে পরিগণিত হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত দেহের অভ্যন্তরস্থ শক্তি জাগ্রতা না হইবেন। তেমনি তান্ত্রিকের পঞ্চ 'ম'—কারের (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন) বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অর্থ রহিয়াছে। যেমন—মদ্য হইল পরমব্রহ্মের পূর্ণানন্দময়

জ্ঞান ; যে-কর্ম দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা হয় তাহারই নাম মাংস ; কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহিত শিবের কাল্পনিক সংযোগই মৈথুন।

সাধক ভোগের মধ্য দিয়াই মোক্ষের পথে অগ্রসর হইবেন তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। মনে হয় এইজন্যই তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে স্থূল অর্থে পঞ্চ 'ম'-কারের সমধিক প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। তান্ত্রিক সাধকগণ এই সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। 'যে-উদ্দেশ্যেই ভোগমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করা হউক না কেন, ভোগলালসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই থাকে এবং ইহা মানুষকে সমস্ত উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করে। তাই তান্ত্রিক আচার্যগণ সাধারণ সাধকের জন্য এই ভোগমার্গের বিধান করেন নাই, চরম সাধকের জন্যই এই চরম মার্গের বিধান। বোধহয় চরম সাধক লোভমোহাদি রিপুর হস্ত হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারেন তাহারই পরীক্ষার জন্য, সর্বপ্রকার বিকারের মধ্যেও যিনি অবিকৃত তিনিই প্রকৃত সাধক, প্রকৃত বীর—এই সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ বীভৎস সাধনপ্রণালীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। যিনি এই সাধনপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহস করিতেন, তাঁহাকে বলা হইত বীর ; কারণ, অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী না হইলে কেহ এ-পথের পথিক হইতে পারে না। যে মদ্য দেবতাগণেরও মত্ততা আনয়ন করে সেই মদ্য যাঁহাকে বিকৃত করে না সেই প্রকৃত তান্ত্রিক। এ-পথে যে প্রতি পদে বিপদ ও পতনের সম্ভাবনা, সুতরাং সাধারণের পক্ষে এ পথ অবলম্বন করা যে শ্রেয়স্কর নহে সেদিকে তান্ত্রিক আচার্যগণ বিশেষ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রকৃত অধিকারী ছাড়া—কুলমার্গের অনুবর্তীগণ ব্যতীত আর কেহই এ-পথ অবলম্বন করিবেন না—ইহাই হইল সাধারণ নির্দেশ। উপর্যুক্ত গুরুর নিকট হইতে এই সাধনপদ্ধতির গূঢ় রহস্য ও ক্রম না জানিয়া যে-ব্যক্তি নিজে নিজেই ইহার সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে

কৃতকার্যতা লাভ করিতে তো পারেই না, পক্ষান্তরে শুধু হাতে সাঁতার দিয়া অপার সমুদ্র পার হইতে গেলে যেরূপ উপহাসাস্পদ হইতে হয় সেইরূপ হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। খড়্গধারার উপর দিয়া গমন করা, বাঘের গলা জড়াইয়া ধরা, সাপ ধরিয়া রাখা প্রভৃতি সমস্ত দুষ্কর কার্য অপেক্ষা দুষ্কর—একরূপ অসাধ্য—এই সাধন পথ। সুতরাং সাধারণের পক্ষে এ-পথ অবলম্বন করা আদৌ বিধেয় নহে। শাস্ত্রের এই সকল স্পষ্ট উক্তি অনুধাবন করিলে কাহারও মনে কি এরূপ সন্দেহ জাগিতে পারে যে, সাধারণকে অসৎ পথে প্ররোচিত করিবার জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি?' (তন্ত্রকথা—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী)। কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ পালন না করিয়া একশ্রেণীর সাধক এরূপ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেন যে, ফলে তাঁহারা জনসাধারণের চক্ষে নিতান্তই হেয় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহারাই তন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের অশ্রদ্ধার কারণ। এই সঙ্গে আরও একটি কথা ভাবিতে হইবে যে, তন্ত্রের যে-সব ঘৃণ্কারজনক পদ্ধতির প্রতি আমরা অশ্রদ্ধাপরায়ণ কোন কোন সাধক কিন্তু উহাদের কোন না কোনটিকেই অবলম্বন করিয়া মুক্তিমার্গের চরম সীমায় পৌঁছিয়া ছিলেন। এইরূপ সাধকদের মধ্যে নেত্রকোণার পূর্ণানন্দ ঠাকুর, ত্রিপুরার সর্বানন্দ ঠাকুর এবং তারাপীঠের বামাক্ষেপার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তন্ত্রের নিজস্ব কোন দার্শনিক মতবাদ আছে কিনা তাহাও বিতর্কের বিষয়। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে 'তন্ত্র মূলতঃ কোনও দার্শনিক মতবাদ নহে; নানা দর্শনশাস্ত্রে পরমার্থ সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে নানাভাবে যত আলোচনা হইয়াছে, সেই আলোচিত সত্যকে লাভ করিবার কার্যকরী পন্থা সম্বন্ধে তত কথা বলা হয় নাই। তন্ত্রের আসল কথাই সত্যকে উপলব্ধি করিবার কার্যকরী পন্থা—অর্থাৎ সাধন-প্রণালী।' কিন্তু অনেকের মতে তন্ত্রেরও নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ রহিয়াছে। অধ্যাপক

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বলেন, 'তন্ত্রোক্ত উপাসনা পদ্ধতি দার্শনিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত। উপাস্য ও উপাসকের—ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্যানুভূতির সহায়তা করা এই উপাসনা-পদ্ধতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই বিশ্বজগৎ ভগবানের অভিব্যক্তি মাত্র—এই জগতের সমস্ত পদার্থ, বিশেষতঃ মানব-শরীর, দৈবীশক্তিতে পরিপূর্ণ এইরূপ ধারণা উপাসকের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্যই তান্ত্রিক উপাসনায় ন্যাস ও অন্তর্যাগাদির বিধান করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নিরর্থক শব্দসমষ্টি বলিয়া যে-তান্ত্রিক মন্ত্রগুলিকে অনেকে উপহাস করিয়া থাকেন সেই মন্ত্রগুলিরও দার্শনিক ব্যাখ্যা তান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত আছে। সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, শব্দরাশিকে তান্ত্রিকগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। শব্দই দেবতার স্বরূপ, শব্দই ব্রহ্ম—এই তাঁহাদের মত। বস্তুতঃ তান্ত্রিক উপাসনার প্রতি অঙ্গেই এইরূপ দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তান্ত্রিক দর্শনও একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সম্প্রদায়। সাংখ্যাদি দর্শনে যেরূপ কতকগুলি তত্ত্ব আছে, তান্ত্রিক দর্শনেও সেইরূপ বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা আছে। বেদান্তাদি দর্শনের সহিত ইহার সম্পর্কও বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। মনে হয়, বেদান্তের সহিতই ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; বেদান্তের অদ্বৈতবাদ তন্ত্রে প্রতি পদে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে।'

তন্ত্র প্রভাবিত অন্যান্য ধর্মমত

তন্ত্রের সাধন প্রণালীকে কেন্দ্র করিয়া মধ্যযুগে অনেকগুলি ধর্ম-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথমেই আমরা বৌদ্ধ সহজিয়াদের কথা উল্লেখ করিতে পারি। আমরা জানি যে, বৌদ্ধ-সঙ্ঘে নারীর প্রবেশাধিকার লাভের পর হইতেই ইহাতে তন্ত্রাচার ও যৌন-মূলক যৌগিক সাধন-প্রক্রিয়া প্রবিষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা তখন দুই দলে বিভক্ত হইলেন। একদল চাহিলেন বুদ্ধদেবের বাণীর এবং অনুশাসনের অবিকল অনুসরণ—তাঁহারা হইলেন হীনযান অর্থাৎ

সংরক্ষণশীল। অন্যদল চাহিলেন হিন্দুদের মত মূর্তিপূজা, তান্ত্রিকতা প্রভৃতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সমন্বয় ঘটান—ইঁহারা হইলেন মহাযান অর্থাৎ উদার মতাবলম্বী। এই মহাযানীদেরই একাংশ তান্ত্রিকতাবাদী হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহাদের ধর্মাচরণের ক্ষেত্র ছিল বাঙ্গলা দেশ। বৌদ্ধ সহজিয়া বা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সম্প্রদায়টি যে-ধর্মসাধনা অনুসরণ করিতেন তাহা তান্ত্রিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে। তাঁহারাও দেহকেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা প্রতিরূপ বলিয়া মনে করিতেন। 'তাঁহারা তাই এই দেহ-নৌকাকেই ভব-সাগরে বাহিয়া চলিবার কথা বলিয়াছেন। ভবসাগরের একটানা স্রোত এই দেহ-নৌকাকে জন্মমৃত্যুর পাকে পাকেই শুধু টানিয়া চলিতেছে; এইবারে নৌকা উল্টামুখে ফিরাইয়া লইয়া অপর কূলে,—জন্ম-মৃত্যুর উর্ধ্বে শূন্যের কূলে গিয়া ভিড়িতে হইবে।' কিন্তু কি করিয়া তাহা করিতে হইবে? মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া সহস্রারে পৌঁছাইয়া দেওয়ার যে তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি রহিয়াছে, এই সম্প্রদায়ের পদ্ধতিও প্রায় একই রূপ—শুধু নামকরণের বিভিন্নতাই লক্ষিত হয়।

সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও এই পথের পথিক। এই মতে ব্যক্তিগত সাধন-শক্তির উপরই জোর দেওয়া হইয়াছিল। কামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহারা কামকে জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। সহজিয়া সাধনে তান্ত্রিকদের মত সাধকের একজন সঙ্গিনী দরকার। কুল-কুণ্ডলিনীকে কোন কোন সাধক ভৈরবীরূপে আবার কেহবা জননীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। শিব ও শক্তির মিলনের ধারণাটি সহজিয়া সাধকদের মধ্যে বিশেষ পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। শিব পুরুষ বা চৈতন্য, শক্তি হইলেন প্রকৃতি এবং এই দুয়ের মিলনই পরমাত্মা-জীবাত্মার মিলন এই তান্ত্রিক মতটি বৈষ্ণবের কৃষ্ণ ও রাধাতত্ত্বে প্রতিভাত হইয়াছে।

নাথপন্থীদের 'কায়া-সাধন'-এর মধ্যেও আমরা এই দেহকেই পরম সত্যলাভের প্রকৃষ্ট বস্তু বলিয়া জানিতে পারি। মৃত্যুর পর মুক্তি নহে,

বাঁচিয়া থাকিয়াই কি ভাবে দেহকে অমর করা যায়, এই নশ্বর দেহকেই দিব্য-দেহ বা সিদ্ধ-দেহে পরিণত করা যায় ইহাই ছিল নাথ-পন্থীদের সাধনার বিষয়। এই সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে দেহ শিবে পরিণত হইয়া যাইবে—আর মৃত্যুঞ্জয় শিবই ছিলেন নাথপন্থীদের সাধনার বিষয় বস্তু। দেহকে শিবে পরিণত করিবার যে পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাই হইল 'কায়া-সাধন'। এই কায়া-সাধনের প্রক্রিয়া আর তান্ত্রিক-প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শিব ও শক্তি সমন্বিত এই দেহই আসল বস্তু। এই দেহের মধ্যে শিব ও শক্তির মিলন ঘটাইতে হইবে। আর এই মিলন ঘটাইবার প্রক্রিয়াও ঐ সকল সাধক-সম্প্রদায় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। শিব ও শক্তির মিলনই আসল উদ্দেশ্য হইলেও শিব ও শক্তিকে পৃথক পৃথকভাবে সাধনা করিবার বিচিত্র পদ্ধতিও গড়িয়া উঠিয়াছিল। শিব হইলেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সেই পরম সত্য। আর তিনিই শক্তিযুক্ত হইয়া জীব ও জগৎ সৃষ্টির মূলে রহিয়াছেন। ভারতীয় কল্পনায় অগণিত দেবতার সৃষ্টি হইলেও পরিণামে তাঁহারা সকলই এই শিব বা আদিদেবে লয় পাইয়াছেন। তেমনই অসংখ্য দেবীরাও পরিণামে শিবের শক্তিতে গিয়া বিলীন হইয়াছেন। আর পরিণামে শিব ও শক্তি এক হইয়া অদ্বিতীয় পরম সত্যে প্রতিভাত হইয়াছেন। এখন আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব কিভাবে এই শক্তি হইতে নৃমুণ্ডমালিনী দেবী কালিকা এবং গিরিরাজ কন্যা উমার বা দুর্গার (শাক্ত পদাবলীতে বন্দিতা দেবী) উদ্ভব হইয়াছিল।

দেবী কালিকার উদ্ভব :

তন্ত্রের উপাস্যা হইলেন শক্তি। এই শক্তিকে নানাভাবে কল্পনা করা হইলেও প্রধানতঃ তাঁহাকে মাতৃকাশক্তিরূপেই কল্পনা করা হইয়াছে। বেদে উল্লিখিত স্ত্রী দেবতারা—রাত্রি, সরস্বতী ইত্যাদি,

পৌরাণিক স্ত্রী-দেবতা—উমা, লক্ষ্মী, মনসা ইত্যাদি, লৌকিক স্ত্রীদেবতা ষষ্ঠী, শীতলা, মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি সকলই এই মাতৃকাশক্তির প্রতীক। তন্ত্র বেদমূলক কিনা এই সম্পর্কে যত বিতর্কই থাকুক না কেন তন্ত্রের মধ্যে যে আর্য ও অনার্য ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে ইহাতে কোন সংশয় নাই। তান্ত্রিকরাই জগন্মাতা দেবী কালিকার রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন।

এখন কথা হইতেছে এই ভীষণা দেবীর পরিকল্পনার ধারণাটি তাঁহারা কোথা হইতে পাইলেন? এই প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভবপর নহে। পণ্ডিতদের মধ্যে একাংশের অভিমত এই যে উলঙ্গিনী, নরমুণ্ডমালিনী, খর্পরধারিণী কালিকা ও নাগ-পরিবৃতাঙ্গ দিগম্বর শিব, লিঙ্গ উপাসক আদিম সমাজের কল্পনা হইতে উদ্ভূত। আর একদল পণ্ডিত মনে করেন যে, শিব হইতেছেন পুরুষ বা চৈতন্য এবং শক্তি হইতেছেন প্রকৃতি বা সত্তা। এই উভয়ের মিলনের মধ্য দিয়াই পরমাত্মা-জীবাত্মার মিলন সূচিত হইতেছে।

কালিকার উদ্ভব সম্পর্কে পুরাণে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু কালীতত্ত্ব প্রথমে পুরাণে কল্পিত হয় নাই। গীতায় বিশ্বরূপে শ্রীভগবানের ব্যাদানকৃত মুখবিবরে দ্রুত প্রবেশশীল ব্রহ্মাণ্ডের, লেলিহান জিহ্বার এবং করাল দ্রংষ্ট্রার বর্ণনা আছে। অনেকে মনে করেন গীতায় বর্ণিত সেই বিশ্বরূপেরই মূর্তি হইতেছেন কালী। কিন্তু যে অভিমতটি সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় তাহা হইতেছে এই যে কালী হইতেছেন প্রকৃতিরই প্রতীক। সৃষ্টির পূর্বে অসীম মহাব্যোম অর্থাৎ মহাশূন্য গাঢ় অন্ধকারে আবৃত ছিল। তারপর একদিন সৃষ্টির উন্মেষ হয়—অন্ধকারের উদর হইতে সৃষ্টি রূপ পরিগ্রহ করিল। সৃষ্টি-পূর্বের ঐ অন্ধকারেরই প্রতীক কালী—তাঁহার উদর হইতেই সৃষ্টির বিকাশ হয়। ঐ মহাশূন্যকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করা হয়। ব্রহ্মই কালী।

এই জন্যই কালী ব্রহ্মময়ী। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বের অনন্ত, অসীম, অব্যক্ত মহাশূন্যকে কেহ বলিয়াছেন ব্রহ্ম কেহ বলিয়াছেন কালী। বেদান্তে ঐ মহাশূন্য হইলেন ব্রহ্ম আর তান্ত্রিকের কাছে ইনিই হইলেন কালী। সৃষ্টির পূর্বে একদিকে যেমন ঐ মহাশূন্যরূপী কালীর কল্পনা অন্যদিকে যে-অখণ্ড কালস্রোত প্রবহমান তাহাকে মহাকালরূপে তান্ত্রিকরা কল্পনা করেন। অন্ধকাররূপিণী কালী মহাকালকে আবৃত করিয়া রাখেন। যিনি শিব মঙ্গলময় তিনিই মহাকাল। এই মহাকাল ও কালীর মিলনের ফলেই সৃষ্টির উদ্ভব হয়। আবার ঐ কালেই সৃষ্টির বিলয় হয়।

প্রকৃতির ঘনকৃষ্ণ রূপের মধ্যে ভারতীয় সাধকরা বহুরূপ ও অরূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন। অনাড়ম্বর সত্যের মূর্তিই কালী। 'এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার; সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণ-পুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না,—যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না, তাহাই তত অন্ধকার।'

সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অন্ধকার দ্বারাই আবৃত ছিল। বেদে ও উপনিষদে সৃষ্টির আদ্যাবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

> ন সদাসীন্নাসদাসীৎ তদানী কিং তম
> আসীৎ।
> আসীৎ ইদংতমসাগূঢ়মগ্রে
> আসীৎ ইদং তমোভূতং
> অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।

সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সৎ বা অসৎ কোন নামেই নির্বচনীয় ছিল না,

অন্ধকার দ্বারা আবৃত ছিল। এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে তমঃ দ্বারাই আবৃত ছিল। ইহা তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞাত এবং লক্ষণহীন ছিল।

অমানিশার গাঢ় অন্ধকারময় মহানিশাই শ্যামা মায়ের পূজার উপযুক্ত কাল। অমাবস্যার এই অন্ধকার সৃষ্টির পূর্বে যে-অবস্থা ছিল তাহারই ভাবের দ্যোতক। ঐ অন্ধকারের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত ছিল। ধ্বংসের পরই সৃষ্টির বিকাশ হয়। প্রলয়ের শেষ এবং সৃষ্টির অন্তরালবর্তী অবস্থাকেই কালীর মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার পর আরম্ভ হইবে সৃষ্টি প্রক্রিয়া, তাই জগজ্জননী শুধু ধ্বংসই করেন না তিনি সৃষ্টিরও আদি জননী। ধ্বংসের বুকে দাঁড়াইয়া প্রলয়-নৃত্যের ছন্দে ছন্দে কালী নবসৃষ্টির উন্মাদনায় কম্পমানা। অন্ধকারের রূপ শুধু ভাবুকের হৃদয়বেদ্য। তাই ভাবুক ভাবসমাধির জন্য এই অন্ধকারেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভীষণের মধ্যে সুন্দরের অপূর্ব্ব সমাবেশ ঐ অন্ধকারের অন্তর্নিহিত রূপ, সব নাম ও রূপের সমাধি এই কালীতেই হইয়াছে বলিয়া তিনি কৃষ্ণকায়া। সাধক যখন রূপাতীত অবস্থায় উপনীত হন তখনই কালরূপ—রূপাতীত রূপ দর্শন করিতে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বের মহাশূন্যরূপী অবস্থার মধ্যে মনকে লইয়া যাইতে পারেন। তখন ধ্বংস ও সৃষ্টির অতীত পরম সত্য সেই কাল রূপের মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া দিতে সক্ষম হন। মহাকাল-স্রোতের মধ্যে বুদ্বুদের মত সৃষ্টি ও ধ্বংসের খেলা চলিতেছে। মা এই মহাকালরূপী শিবকে পদতলে ফেলিয়া কালজয়ী কালীরূপে আবির্ভূতা। মায়েরই ইচ্ছায় একদিকে যেমন সৃষ্টির উদয় অপরদিকে সৃষ্টির বিলয়। মা মহাকালরূপী শিবে শক্তি সঞ্চার করিয়া সৃষ্টির বিকাশ করেন আবার তিনিই সৃষ্টিকে সংহৃত করেন। মহাকাল ও মহাকালী পরম রমণানন্দে মগ্ন। মহাকালী বা শক্তি মহাকালে বা শিবে শক্তি সঞ্চার করিলেই সৃষ্টির উদ্ভব হয়। আবার মহাকালেই সৃষ্টির বিনাশ। বিনাশ না করিলে আবার সৃষ্টি

হইবে না বলিয়া মহাকাল বা শিব মঙ্গলময়। অর্থাৎ মায়ের ইচ্ছায় একদিকে যেমন মহাকাল সৃষ্টির সহায়ক হন আবার তাঁহারি ইচ্ছায় সৃষ্টিকে ধ্বংসও করেন। মহাকাল বা শিব বা পুরুষ নিষ্ক্রিয়। কিন্তু মহাকালী বা শক্তি শিবকে আশ্রয় না করিলে কোন ক্রিয়াই করিতে পারেন না। শিব ও শক্তি অভিন্ন। মা যখন ধ্বংস করেন তখন মহাকালরূপী শিবকে পদতলে নিক্ষেপ করেন, শিব নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়েন, তিনি শবে পরিণত হন, কালস্রোত স্তব্ধ হইয়া যায়। আবার মহাকাল ও মহাকালী—শিব ও শক্তি রমণানন্দে মগ্ন হন। সাধক এই মগ্নাবস্থায় নিজেকে লইয়া যাইতে চাহেন।

কালী বিবসনা। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া যিনি নিজেকে বিবর্তিত করিয়াছেন তাঁহার আচ্ছাদনের অবকাশ কোথায়? জগতে কি এমন কোন বস্তু আছে যাহা দ্বারা অনন্তকে আচ্ছাদন করা যায়?

মা আলুলায়িত কুন্তলা! বন্ধনমুক্তা। সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিলে মাকে লাভ করা যায় না। সর্ববিধ আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া মন যখন মাতৃচরণে ধাবিত হয় তখনই বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তখনই হৃদয়ের বন্ধন শিথিল হয়, সব সংশয়ের অবসান ঘটে।

মায়ের পদতলে শবরূপী শিব। যিনি শিব মঙ্গলময়—তিনিই মহকাল। এই মহাকালই জগতের ভক্ষক। কালেই সমস্ত বস্তুর পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিচ্ছিন্ন জগতের ইহাই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের আশ্রয়ীভূত।

মা এই মহাকালকে পদতলে ফেলিয়া কালজয়ী কালীরূপে আবির্ভূতা। এই ভয়াল রূপের মধ্যে যিনি অভয়ের সন্ধান পাইয়াছেন তিনিই কালজয়ী হইতে পারেন। কালী নৃত্যপরায়ণা—ইহা সৃষ্টির ছন্দের প্রতীক, জগতের প্রতিটি অণু পরমাণু এই নৃত্যছন্দে গতিশীল।

গতিশীলতাই প্রাণচাঞ্চল্য বা জীবনের লক্ষণ। কালীর নেত্রত্রয় ত্রিকালদর্শিতার দ্যোতক। আবার ইহা চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি এই তিন জ্যোতিরও প্রতীক, মা জ্যোতির্ময়ী, জ্যোতির আধার।

শ্যামার দুই বাম হস্তে খড়্গ ও মুণ্ড আবার দক্ষিণ হস্তদ্বয় বর ও অভয়দানে ব্যাপৃত। খড়্গ দ্বারা অশিব অমঙ্গলকে নাশ করিয়া তাহার মুণ্ড ধারণ করিয়া অমঙ্গলের প্রতি সন্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—দুষ্কৃতকারীর ক্ষমা নাই, কালের করাল খড়্গ তাহার স্কন্ধে পতিত হইবেই। তিনি যে শুধু দুষ্টের সংহার-কারিণীই নহেন, আশ্রিতকে বর ও অভয়ও দেন—ইহাও দক্ষিণহস্তে প্রকটিত। তিনি শ্যামা স্নিগ্ধা, রূপের উজ্জ্বলতা নয়নবিদাহী নহে—শ্যামারূপ নয়ন স্নিগ্ধকারী। দেবী কালিকার মূর্তির মধ্যে, তাঁহার রূপ কল্পনার মধ্যে সৃষ্টি ও প্রলয়, উগ্র ও স্নিগ্ধ, রক্ষণ ও ধ্বংসের এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য হইয়াছে যাহা অন্য কোথাও দেখা যায় না।

কালী সাধনা ভয়ঙ্করকে জয়ের সাধনা

কালীর সাধন-পদ্ধতি আপাত-দৃষ্টিতে অত্যন্ত ভয়াবহ বলিয়া প্রতিভাত হয়। মায়ের পূজার কাল অমাবস্যার মহানিশা। স্থান—শবমাংসলুব্ধ শিবাকুলের ঘোরনাদে উচ্চকিত পরম লয়ের স্থান মহাশ্মশান। অমাতমিস্রার মহানিশা, নির্বাপিত প্রায় শ্মশানাগ্নিশিখা অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে লেলিহান জিহ্বা বিস্তারে সে অন্ধকারকে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে, মাংসলোলুপ শিবাকুলের চীৎকার মহানিশার নিস্তব্ধতাকে আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। এই বিভীষিকাময় পরিবেশের মধ্যেও মাতৃসাধক অচঞ্চল। নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মত তাঁহার চিত্ত মাতৃধ্যানে মগ্ন। ভয়ঙ্করকে জয় করিবার শুভ মুহূর্ত সমাগত—তাই সাধক ভীষণ পরিবেশের মধ্যেই নিজেকে সমাহিত করিয়াছেন। সম্মুখে

মুণ্ডমালাবিভূষিতা মায়ের মূর্তি। মানুষের কল্পনায় যত কিছু বীভৎস বস্তু আছে সবই মায়ের পটভূমিকায় সমাহৃত। এই ভয়াবহ পটভূমিকার সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া মায়ের ভয়াবহ মূর্তি পরিকল্পিত হইয়াছে। দেবী করালবদনা ঘোরকৃষ্ণবর্ণা আলুলায়িতকুন্তলা দিগ্বসনা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, কর্ণভূষণ শিশু-শবদ্বয়, কটিবন্ধ নরহস্ত, জিহ্বা সর্বদাই রক্তলোলুপ, তাঁহার মুখনিঃসৃত ঘোরনাদে শ্মশানভূমি প্রকম্পিত, তিনি শবরূপী কালজয়ী শঙ্করের বক্ষোপরি নৃত্যপরায়ণা। চতুর্দিকে শ্মশান সহচর শকুনি, কাক, শিবাকুল শবমাংস ভক্ষণে রত। এই হৃৎকম্পকারী ভয়াবহ পরিবেশে বসিয়া সাধক ইহাকেই মা বলিয়া আহ্বান করিতেছেন—ইহার মধ্যে মায়ের চিরমঙ্গলময়ীরূপের সন্ধান পাইয়াছেন। ভয়কে জয় করিতে না পারিলে, অন্ধকারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে না পারিলে আলোর রাজ্য পাওয়া যায় না, এই তত্ত্বই কালীমায়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভয়ঙ্কর পরিবেশে সুগুপ্ত।

শক্তিপূজার স্থান শ্মশান কেন নির্দিষ্ট হইল? কারণ এই শ্মশানই মরজগতের শেষ আশ্রয়স্থল। জগতের সর্বপ্রকার সুখ-দুঃখের সমাপ্তি হয় এই শ্মশানেই। মৃত্যুর মধ্যে শুধু ধ্বংসের দিকটা দেখি বলিয়াই শ্মশানকে আমরা ভয় পাই। কিন্তু সাধক ধ্বংসের মধ্যে যে সৃজনী-শক্তির বীজ নিহিত থাকে তাহাকে দেখিয়াছেন। শ্মশান সর্বপ্রকার প্রভেদলোপের স্থান। দুঃখজ্বালার তীব্র দহনে যখন চিত্ত শ্মশানের মতই অগ্নিময় হইয়া উঠে তখনই শ্মশানবাসিনী মায়ের চরণ আশ্রয় নেওয়ার উপযুক্ত সময়। ভক্ত কামনা-বাসনা শূন্য করিয়া হৃদয়কে শ্মশানে পরিণত করিয়া মায়ের আগমন প্রার্থনা করেন।

কামরূপ ও বাঙ্গলা দেশ তন্ত্র-সাধনার পীঠভূমি। বাঙ্গলার শ্যামল রূপের মধ্যেই তান্ত্রিক সাধকরা মায়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন। আবার এই শ্যামল রূপের মধ্যেই ভয়ঙ্করী প্রকৃতির রুদ্রলীলা আমরা দেখিতে

পাই। 'এক ঋতুতে গভীর তমিস্রার ন্যায় মেঘকুন্তলা দিগ্‌বধূগণ তাঁহাদের গাঢ় অন্ধকার লহরীর বেণী দোলাইয়া দিয়া বিদ্যুৎ-কটাক্ষের পৈশাচিক দীপ্তি দ্বারা পথিককে ভয় দেখাইয়াছেন; অপর ঋতুতে শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী প্রেমাবেশে ঢুলু ঢুলু চোখে চাহিয়া দম্পতি-হৃদয়ে আনন্দ ঢালিয়া দিতেছেন। একদিকে যেমন বঙ্গ-প্রকৃতি খাঁড়া ও নরমুণ্ড দেখাইয়া আতঙ্কিত করিতেছেন, আর একদিকে তেমনি বিচিত্র আনন্দ ও শোভাসম্পদ লইয়া যেন আমাদিগকে বর দিতেছেন। এক হস্তে উত্তোলিত খড়্গে বিদ্যুতের ঝলক খেলিতেছে, অপরদিকে প্রসারিত করপদ্ম দ্বারা মাতা মাভৈঃ এই ইঙ্গিত করিতেছেন। সুতরাং আমাদের দেশ যে, বিশেষভাবে এই করালবদনা, মহীয়সী, মধুরহাসিনী মাতৃ-দেবতার অধিকারে, তাহা আর বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না। এই ভীষণ রূপের সহিত সুন্দরের সমাবেশ শাক্ত কবি ছাড়া আর কে করিতে পারিয়াছেন?' (দীনেশচন্দ্র সেন)।

শাক্ত সাধকদের আবির্ভাব এই বঙ্গদেশেই সর্বাধিক ঘটিয়াছিল। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, বিষ্ণু সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ এবং তার কিছু পরবর্তীকালের ময়মনসিংহের কাটিহালি গ্রামের মহাসাধক যোগীশ্রেষ্ঠ পূর্ণানন্দ, ত্রিপুরার মেহার গ্রামের সাধক সর্বানন্দ, ময়মনসিংহের পণ্ডিতবাড়ী গ্রামের সাধকপ্রবর দ্বিজদেব, ঢাকার মায়েসার গ্রামের গোঁসাই ভট্টাচার্য, বীরভূমের বামাক্ষেপা এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব প্রভৃতি যোগিবৃন্দ তান্ত্রিক সাধনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গলাদেশে তান্ত্রিক সাধনার তথা দেবী কালিকার প্রভাব যে কত অধিক তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'এর সন্তানদল এবং বাঙ্গলাদেশের বিপ্লবী দলের উপাস্যা দেবী হইলেন এই কালিকা। ঋষি অরবিন্দও এই তান্ত্রিকতার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত

হইয়াছিলেন। জীবনযাত্রার প্রতিটি অংশে মা কালীর প্রভাব বিদ্যমান। বাঙ্গলাদেশে দুর্গাপূজার পরই কালীপূজায় সর্বাধিক সমারোহ হইয়া থাকে। সমারোহের কথা বাদ দিলে সাধনার ক্ষেত্রে কালী দেবীরই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। অবশ্য মূলতঃ দুর্গা এবং কালী ভিন্না নহেন। সমগ্র বাঙ্গালী জাতি এই শক্তির উপাসক।

দেবী দুর্গার উদ্ভব :

পুরাণ বর্ণিত সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনীই হইলেন দেবী দুর্গা। অসুরদের সম্রাট মহিষাসুর একবার দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র পরাভূত হইলেন এবং মহিষাসুর ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন। তখন দেবতাদের দুর্গতির আর সীমা থাকিল না। সমস্ত দেবতারা গিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বিষ্ণু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন আর অন্যান্য দেবতারা তো ক্রোধাকুল ছিলেনই। এই ক্রুদ্ধ দেবকুলের মুখ হইতে তেজ নির্গত হইতে লাগিল। সেই অশেষ তেজঃপুঞ্জ হইতে ত্রিভুবন উজ্জ্বলকারিণী এক দেবী সমদ্ভুতা হইলেন। সমস্ত দেবগণ বিভিন্ন অস্ত্র দিয়া এই দেবীকে রণ-সাজে সজ্জিতা করিয়া দিলেন। ইনিই মহিষাসুরমর্দিনী। এই দেবীই পরবর্তীকালে দুর্গারূপে বন্দিতা হইয়াছেন। বাঙ্গলাদেশই দুর্গাপূজার প্রধান কেন্দ্র। অনেকের অনুমান এই যে, দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বাঙ্গালাদেশে দুর্গাপূজার প্রথম সূত্রপাত হয়।

দুর্গাপূজা প্রধানতঃ উৎসবপ্রধান পূজা। এই পূজার উদ্ভব সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। এক শ্রেণীর মত এই যে, মূলতঃ শস্য সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে দুর্গাদেবী পরিকল্পিত হইয়াছিলেন। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এ দেবী দুর্গাকে শাকম্ভরী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দুর্গা-প্রতিমার পার্শ্বে যে নবপত্রিকা বা কলা-বৌ স্থাপন করা হয় তাহা নয় প্রকারের শস্য দ্বারা রচিত হইয়া থাকে, যথা—কদলী, কচু, হরিদ্রা, যব,

বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মানকচু ও ধান্য। কাজেই দেবী নিঃসন্দেহে শাকম্ভরী অর্থাৎ তিনি শাকসব্জী দ্বারা নিজেকে পূর্ণ করিয়া রাখেন। অনাবৃষ্টিই হইতেছে শস্যসৃষ্টির প্রধান বাধা। মহিষাসুর এই অনাবৃষ্টির প্রতীক। দেবী এই অসুরকে তাই নিধন করিয়াছেন।

অপর মতে বর্ষার অন্তে প্রাচীনকালের রাজা মহারাজারা দেবী-পূজার উৎসব করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। সেই হইতেই এই শারদীয় উৎসবের প্রচলন। যে-মতটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় তাহা হইতেছে এই যে, শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালেই দেবীকে বোধন করিয়া রাবণবধের জন্য বর লাভ করিয়াছিলেন। এমনিতে বসন্তকালই দেবীপূজার বিধিসম্মত কাল। বাল্মীকি-রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ নাই। তাহাতে রাবণবধ শরৎকালেও হয় নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য কৃত্তিবাস কোন প্রচলিত উপাখ্যানকে হয়ত তাঁহার কাব্যে রূপ দিয়াছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে রচিত 'কালিকা পুরাণ', 'দেবী ভাগবত' এবং 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ'-এ রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক শরৎ-কালে দেবীপূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ই বিপুল অনুষ্ঠানের সঙ্গে বাঙ্গলাদেশে শরৎকালে দেবীপূজার প্রচলন হয়। মনে হয়, তখন পর্যন্ত দেবীর বাসন্তীপূজাই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। শারদীয় পূজাও হয়তো ছিল কিন্তু তাহার বিশেষ প্রচলন ছিল না। এই জন্যই শরৎকালে দেবীপূজার প্রচলন করিতে গিয়া দেবীর অকাল-বোধন কাজটি সম্পন্ন করাইতে হইয়াছে। রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকাল-বোধনের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া এই কাজটি করা হইল। কিন্তু কোথা হইতে এই দৃষ্টান্ত আনা হইল তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, দুর্গাপূজা প্রধানতঃ উৎসব প্রধান। ইহার সহিত বঙ্গদেশের মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র তথা জমিদারী

ও তালুকদারী তন্ত্রের যোগ রহিয়াছে। দরিদ্রের দুর্গাপূজা করিবার উপায় নাই। এই উৎসব প্রাধান্যের জন্যই বাঙ্গলাদেশে সাধনার ক্ষেত্রে দেবী দুর্গা প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। কালী এবং দশ-মহাবিদ্যার অন্যান্য দেবীগণ এই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। বিভিন্ন পুরাণ এবং উপ-পুরাণের মধ্যে দেবী কালিকার কথা যেভাবে পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, উমা, দুর্গা, গৌরী, চণ্ডী, পার্বতী অর্থাৎ এক কথায় দেবী দুর্গা এবং কালিকা অভিন্না। দেবী কালিকাই হইতেছেন মূলদেবী এবং পার্বতী হইতেছেন এই মূলদেবীর রূপভেদ মাত্র।

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দক্ষ-কন্যা সতী গিরিরাজ পত্নী মেনকার গর্ভে পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই উমা বা দুর্গাই শাক্ত-পদাবলীকারগণের আরাধ্যা দেবী। কালী, সতী এবং পার্বতী বা উমা ইঁহারা সকলেই শিবের শক্তি অর্থাৎ মূলতঃ ইঁহারা এক ও অভিন্না।

শাক্ত পদাবলীর ধারা

শাক্ত পদাবলীর বিশিষ্ট প্রকাশ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ঘটিয়াছিল। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের ভক্তিমূলক সঙ্গীতগুলি লইয়াই শাক্তপদাবলীর যাত্রা আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার পূর্বেও শাক্ত-সাহিত্যের বিকাশ ঘটিয়াছিল। শাক্ত-সাহিত্যে যে-দেবীর বন্দনা করা হইয়াছে তিনি তান্ত্রিক দেবী। তান্ত্রিকদের কাছে এই দেবীই পরমাত্মা শক্তির বিশ্বব্যাপিনী বিরাট রূপ। অর্থাৎ ইনিই জগজ্জননী। মাতৃভাবে সর্বশক্তিমান পরমাত্মাকে যাঁহারা সাধনা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই দেবীই সেই মাতা। মাতৃভাবে ভগবানকে আরাধনা করিবার রীতিটি

ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। এই সাধনাকে ভিত্তি করিয়া ভারতবর্ষে এক বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। শাক্ত পদাবলীর উৎস হিসাবে এই সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অত্যাবশ্যক। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন দর্শন ও পুরাণ গ্রন্থ, বিরাট তন্ত্রশাস্ত্র, ধর্মমূলক স্তোত্র ও কবিতা, প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রকীর্ণ-কবিতা, বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সাধন সঙ্গীত, চর্যাপদ এবং মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য-গুলিকে আমরা শাক্তপদাবলীর উৎস বলিতে পারি।

ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্তে অন্ধকারের যে রূপকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে কালীমূর্তির রূপকল্পনার প্রতিরূপ পাওয়া যাইতেছে। বেদান্তদর্শনের মায়াবাদের, সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রভাব শাক্তপদাবলীর বহুপদে বর্তমান।

দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ এবং হিমরাজগৃহে তাঁহার জন্ম ইত্যাদি বহু কাহিনী দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয়চণ্ডী প্রভৃতি পুরাণে উল্লিখিত কাহিনী হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে করালবদনা ভয়ঙ্করী চামুণ্ডাদেবীর যে বর্ণনা আছে শাক্তপদাবলীতে তাহার সুস্পষ্ট ছায়াপাত হইয়াছে।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাবই শাক্তপদাবলীতে সর্বাধিক প্রতিফলিত হইয়াছে। জগজ্জননীর রূপকল্পনায় শাক্তপদকর্তাগণ তন্ত্রে উল্লিখিত দেবীর ধ্যান মন্ত্রগুলি অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। দেবীর দশমহাবিদ্যা রূপই তান্ত্রিকদের উপাস্যা। বহু শাক্তপদাবলীতে এই দশমহাবিদ্যার রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে। তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার যে স্তব আছে শাক্ত-পদকারগণ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।*

বেদ, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র ইত্যাদিতে বর্ণিত দেবীর রূপ সংস্কৃত সাহিত্যিকগণের কল্পনাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সংস্কৃত-সাহিত্যে তাই

* শক্তিতত্ত্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এই দেবীর বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে, ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকে, শঙ্করাচার্যের রচনাবলীতে এবং বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক'-এ এই দেবী বর্ণিতা হইয়াছেন। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'আর্যাসপ্তশতী' প্রভৃতি সংস্কৃত কবিতার সঙ্কলন গ্রন্থেও দেবী কালিকার রূপ কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃত কবিতার সঙ্কলন গ্রন্থ 'প্রাকৃত পৈঙ্গল'-এও এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

বৌদ্ধগান ও দোহাবলীর সহিত শাক্তপদাবলীর গভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। চর্যাপদের 'ডোম্বী', 'চণ্ডালী', এবং শাক্ত-সঙ্গীতের কুণ্ডলিনী এক ও অভিন্না।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব শাক্তপদাবলীর উপর পড়িয়াছে ইহা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। শাক্তপদাবলীর বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

শিবায়ন, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলিতে যে দেবীর কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে তিনি শাক্তপদাবলীর দেবী ছাড়া আর কেহ নহেন। 'মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উপপ্লবের ফলে মাতৃকা-চরণে শরণ গ্রহণ করার যে সংবেদন দেখা যায়, শাক্তপদাবলীতেও তাহা বর্তমান। বিপন্ন অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার আকূতি লইয়াই মঙ্গল দেবদেবীর কল্পনা ও তাঁহাদের চরণে আশ্রয়-লাভের কামনা জাগ্রত হইয়াছিল। শাক্ত-সঙ্গীত-সৃষ্টির প্রেরণামূলও সেই অত্যাচার, বিপ্লব ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থা। তবে মঙ্গলকাব্যের ভক্তের আকূতি, কেবল পার্থিব সঙ্কট হইতে মুক্তির আকূতি; তাঁহাদের ইচ্ছা ঐহিক ঋদ্ধি লাভের ইচ্ছা। পৌরাণিক 'রূপং দেহি জয়ং দেহি', 'ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে' এই প্রার্থনাই মঙ্গলকাব্যের ভক্তের প্রার্থনা। শাক্ত-পদাবলীর প্রার্থনা মুমুক্ষু ভক্তের প্রার্থনা: 'কার সমাধি হবে শ্যামাচরণে।'

পূজা-প্রচারের আগ্রহে দেবী-মহিমার অপপ্রচার যেমন মঙ্গলকাব্যে আছে, শাক্তপদাবলীতে তাহা নাই। শাক্তপদাবলীর দেবীর পূজা-প্রচারের প্রয়োজন নাই, পূজ্যারূপেই তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা। এই জন্য মঙ্গলকাব্যে যেমন মুহুর্মুহু তিনি ভক্তের নিকট আবির্ভূতা হইয়াছেন, শাক্তপদাবলীতে তেমনই তিনি অলক্ষ্যচারিণী হইয়া থাকিয়াছেন। শাক্তপদাবলীতে দেবী যোগগম্যা: 'তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে সদা যোগী করে মনন।' কেবল আগমনী ও বিজয়ার গানে তিনি প্রত্যক্ষ কন্যা।' (অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী)।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদের সমসাময়িক কবি ভারতচন্দ্রে আসিয়া মঙ্গলকাব্যের যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। খণ্ড কবিতা হিসাবে অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত গানের আকারে শাক্তপদাবলীর তখনই উদ্ভব হয়। মঙ্গলকাব্য পর্যন্ত শাক্তপদাবলীর যে-ধারা আমরা দেখিতে পাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত শাক্ত-পদাবলীর সঙ্গে তাহার যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কেন এই বৈসাদৃশ্য?

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত একশত বৎসরের বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস প্রজাপুঞ্জের উপর রাজশক্তির নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারের ইতিহাস। ধনী মুহূর্তের মধ্যে পথের ভিক্ষুকে পরিণত হয়; দরিদ্র বিনা কারণে প্রাণ দেয়—জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক অভাবনীয় অনিত্যতার প্রভাব দেখা দিল। এই নিদারুণ বঞ্চনা হইতে আত্মরক্ষার তাগিদে শাক্ত-গীতির জন্ম হইল। অত্যাচারের সম্মুখীন হইবার সাহস এবং অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার কামনা—এই দুই প্রকার মনোভাবের সংমিশ্রণ শাক্ত পদাবলীর মধ্যে রূপ লাভ করিল। বৃহৎ কাব্যের আকারে দেখা না দিয়া এই মনোভাব ক্ষুদ্র কবিতার মধ্য দিয়া কেন আত্মপ্রকাশ করিল এই কথাটি স্বভাবতঃই মনে আসিতে পারে। প্রথমতঃ এই কবিতাগুলিতে যে-আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হইয়াছে

তাহার পক্ষে কোন কাহিনীর প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, বৈষ্ণব কবিতার আদর্শ শাক্ত কবিগণের সম্মুখে বিদ্যমান ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীতে বিশুদ্ধ ভক্তিরসের বিকাশ ঘটিয়াছে। কামনা-বাসনা বর্জিত মনোভাব হইতে জাত এই সকল কবিতা এক সর্বজনীন আবেদনে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। শাক্ত কবিদের উপর সেই প্রভাব অনিবার্যভাবেই আসিয়া পড়িল। ফলে শাক্ত কবিগণের আত্মনিবেদনের সুর ভক্তি-রসাশ্রিত হইয়া মূল কাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং গীতি কবিতার আকারে আত্মপ্রকাশ করিল। 'মনে হয় মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করিয়া চৌতিশায় যে স্তব-স্তুতি ও আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহাই শাক্ত পদাবলীতে আখ্যায়িকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও নিঃস্বার্থ ভক্তিবাদে উদ্বর্তিত হইয়া বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর দৃষ্টান্ত ও প্রভাবও সুরের এই বিশুদ্ধীকরণের সহায়তা করিয়াছে। মায়ের ভালবাসা যেমন সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার উর্ধ্বে অবস্থিত থাকিয়া নিজ অনাবিল, অকৃত্রিম ভাব-মাধুর্য বিকিরণ করে, তেমনি মাতৃনির্ভর অধ্যাত্ম সাধনাও সমস্ত ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ও কেবল মুক্তি কামনা করিয়া অপার্থিব ভক্তিরসকেই ঘনীভূত করিয়াছে।' (ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। কাজেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তীকালে যে-শাক্ত সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে অষ্টাদশ শতক ও তৎপরবর্তীকালে শাক্ত পদাবলীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

শাক্ত পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ

শাক্ত পদাবলীকে দুইটি প্রশস্ত বিভাগে ভাগ করা যায়—উমা সঙ্গীত ও কালীকীর্তন। উমা-সঙ্গীত অংশে জগজ্জননীর লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই লীলা তিনি ভক্তের গৃহে কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। উমা-সঙ্গীতের তিনটি অংশ—(১) বাল্যলীলা (২) আগমনী (৩) বিজয়া।

কালী-সঙ্গীত বা কালীকীর্তনে নরমুণ্ডবিভূষিতা ভয়ঙ্করী দেবীর রূপ ও তাঁহাকে কি করিয়া সাধনা করিতে হইবে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ শাক্ত পদাবলীর এই অংশের দুইটি বিভাগ—(১) জগজ্জননীর রূপ অথবা শক্তিতত্ত্ব (২) জগজ্জননীর সাধন-পদ্ধতি। এই দুইটি অংশকে আবার বহু সূক্ষ্ম অংশে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন—

(ক) মা কি ও কেমন (খ) ইচ্ছাময়ী মা (গ) করুণাময়ী মা (ঘ) কালভয়হারিণী মা (ঙ) লীলাময়ী মা (চ) ব্রহ্মময়ী মা	জগজ্জননীর রূপ বা শক্তিতত্ত্ব
(ক) ভক্তের আকৃতি (খ) মনোদীক্ষা (গ) মাতৃপূজা (ঘ) সাধনশক্তি (ঙ) নাম মহিমা (চ) চরণতীর্থ	জগজ্জননীর সাধন পদ্ধতি বা শক্তি-সাধনা

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উমা ও কালী এক ও অভিন্না এবং উমা-সঙ্গীত ও কালীকীর্তন এই দুই মিলিয়াই শাক্ত পদাবলী।

উমা-সঙ্গীত

(বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়া)

বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ, বিচিত্র তাহার ধর্ম এবং তাহার সাধনবৈচিত্র্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন, 'যথা যে মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। (যিনি যে প্রকারে আমাকে উপাসনা করেন, আমি তাঁহাকে সেই ফলপ্রদান দ্বারাই অনুগৃহীত করি।)—বস্তুতঃ ইহাই ভারতীয় সাধনার মূল কথা। যুগে যুগে সাধক, সিদ্ধাচার্য, ভক্ত সকলেই তাঁহাদের উপাস্যকে, যিনি অবাঙমানসগোচর সেই 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা'-কে উপলব্ধি করিয়াছেন আপন আপন ভাব সাধনায়। কোথাও তিনি প্রভু, তিনি সখা, তিনি পিতা তিনি কান্ত; আবার কোথাও তিনি মাতা, তিনি কন্যা। ভক্তের আকুল আহ্বানে এমনই করিয়া যুগে যুগে প্রকটিত হইয়াছে ভগবানের নিত্যলীলা। ভক্ত আছেন বলিয়াই ভগবানের মাহাত্ম্য, আর এই জন্যই তিনি ভক্তের ভগবান। ভগবানের যত লীলা তাহার মধ্যে 'সর্বোত্তম নরলীলা'। এই মানুষী লীলায় মানুষের মতই তাঁহার আচার-আচরণ, তাঁহার নর-দেহ ধারণ। তিনি মায়াধীশ, তিনি প্রেমময়, প্রেমের দুর্বার আকর্ষণেই তিনি মায়ার অধীন হইয়াছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াছেন বাল-গোপাল রূপে যশোদার কোলে। আর জগদীশ্বরী লীলা করিয়াছেন মানবকন্যা উমারূপে গিরিজায়া মেনকার কোলে।

ভারতীয় সাধনা শুধু জ্ঞানমার্গে নয়, বিচার মার্গে নয়, প্রেম ও ভক্তির মার্গে। সেই জন্যই ইহা এত মধুর, আর এই মধুর রসের উৎসভূমি সুজলা-সুফলা-শ্যামা বাঙ্গলা। (রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন 'বাঙ্গলার জলবায়ুতে মধুর রস বিরাজ করে, তাই বাঙ্গলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশঃ মাতা অন্নপূর্ণারূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদ বিধুর কন্যারূপে,—মাতা, পত্নী ও কন্যা, রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দররূপে দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে মধুররস সঞ্চার করিয়াছেন।'

বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়া শীর্ষক সঙ্গীতগুলিতে আমরা জগজ্জননীর লীলা দেখিতে পাই। দক্ষযজ্ঞকালে পতির অপমানে সতী প্রাণত্যাগ করিলেন। অতঃপর ভক্ত হিমালয়ের অনুরোধে তিনি তাঁহার কন্যারূপে আবির্ভূতা হইলেন। পর্বতের কন্যা পার্বতী হেমাঙ্গীরূপে দেখা দিলেন। কৃষ্ণবর্ণা দেবী গৌরী হইলেন। দেবীর এই গৌরী হওয়ার একটি সুন্দর পৌরাণিক ব্যাখ্যা আছে। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গে শক্তি-সাধনায় কালী-প্রাধান্য' নামক প্রবন্ধে কাহিনীটি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

'পদ্ম-পুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে যে বর্ণনা পাই তাহার অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। সেখানে দেখিতে পাই দক্ষ-সুতা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য যখন মাতা মেনকার জঠরে ছিলেন তখন ব্রহ্মা ভগবতী রাত্রি দেবীকে স্মরণ করিলেন। ব্রহ্মা রাত্রিদেবীকে বলিলেন যে, পার্বতী জন্মমাত্রই 'হরসঙ্গমলালসা' হইবেন; কিন্তু দেবীর কঠোর তপস্যার পরে যদি পুত্র না হয় তবে সে পুত্র তারকাসুর বধের অধিকারী হইবে না; সুতরাং হর-পার্বতীর মধ্যে কিঞ্চিৎ বিবাদের কারণ ঘটান প্রয়োজন। এই বিবাদের নিমিত্ত স্বরূপই ব্রহ্মা রাত্রিদেবীকে অনুরোধ করিলেন তাঁহার অমোঘ মায়ায় মাতৃকুক্ষিতেই দেবীকে কৃষ্ণবর্ণা করিয়া দিবার জন্য; রাত্রিদেবীও তাহাই করিলেন। তাহার পরে কুমারসম্ভবের অনুরূপ-ভাবে পার্বতী এবং মহাদেবের বিবাহ হইল। রম্য মন্দিরমধ্যে শঙ্কর-পার্বতী যখন শয়ন করিয়াছিলেন তখন শশিমৌলী শুভ্রদ্যুতি মহাদেবের দেহলগ্না নীলোৎপলদলচ্ছবি অসিতাপাঙ্গী পার্বতীকে বিভাবরী দেবীর সংযোগে তখন অতিতমোময়ী দেখাইতেছিল—

গিরিজাপ্যসিতাপাঙ্গী নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ।
বিভবর্ষা চ সংপৃক্তা বভুবাতিতমোময়ী॥

শঙ্কর তখন উপহাস করিয়া দেবীকে বলিয়াছিলেন—

শরীরে মম তন্বঙ্গি সিতে ভাস্যসিতদ্যুতিঃ।
ভুজঙ্গীবাসিতা শুভ্রে সংশ্লিষ্টা চন্দনে তরৌ॥

হে তনুদেহি, আমার শুভ্র শরীরে কৃষ্ণবর্ণা তুমি শোভা পাইতেছ—ঠিক যেন শুভ্র চন্দনতরু দেহে একটি কালভুজঙ্গিনী।

এমন উপহাসে দেবী অত্যন্ত কুপিতা হইলেন এবং পিনাকীর কণ্ঠ পরিত্যাগপূর্বক কঠোর ভাষণে কলহে প্রবৃত্তা হইলেন। দেবী যেমন অতি তীক্ষ্ণ ভাষায় শিবের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন, শিবও এ বিষয়ে কিছু পশ্চাৎপদ ছিলেন না। দেবীকে তিনি যে বক্রোক্তি করিলেন তাহা অতি প্রাসঙ্গিক না হইলেও উদ্ধারযোগ্য। শিব দেবীকে কিছুতেই শান্ত করিতে সমর্থ না হইয়া বলিলেন,—সত্য সত্য সর্ব-অবয়বের দ্বারাই তুমি পিতৃসদৃশ—

হিমাচলস্য শৃঙ্গস্থমেঘজালাকুলং মনঃ।
তথা দুরবগাহেভ্যো গহনো হি তবাশয়ঃ॥
কাঠিন্যমশ্মসারেভ্যো বনেভ্যো বহুলাঙ্গতা।
কুটিলত্বং নিম্নগাভ্যো দুঃসেব্যত্বং হিমাদপি॥

হিমালয়ের শৃঙ্গস্থমেঘজালাকুল তোমার মন, তাহার দুরবগাহত্ব হইতে তোমার গহন হৃদয়, প্রস্তরসমূহ হইতে তোমার কাঠিন্য, বনসমূহ হইতে তোমার বহুলাঙ্গতা, নিম্নগা (স্রোতস্বিনী) সমূহ হইতে তোমার কুটিলত্ব এবং হিম হইতে তোমার দুঃসেব্যত্ব।

এইরূপে কলহের পরে স্বামীর গৃহ হইতে দেবী যখন বাহির হইয়া যাইতেছিলেন তখন পুত্র বীরক আসিয়া পথ রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'আমাদের ফেলিয়া মা কোথায় যাইতেছ?' দেবী উত্তর করিলেন—

'আমি দুষ্কর তপস্যা দ্বারা শঙ্করকে পতি লাভ করিয়াছি, কিন্তু সে আমাকে নিভৃতে বহুবার শ্যামলবর্ণা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে; তাই

আমি কাঞ্চনাভবর্ণা এবং সেইরূপ নাম সংযুক্তা হইয়া ভূতপতি ভর্তার অঙ্গসঙ্গিনী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি।' দেবীর এই কথা শুনিতে পাইয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—'তাই হোক, তুমি ভর্তার দেহার্ধচারিণী হও।' তখন দেবী ফুল্লনীলোৎপলবর্ণ দেহের কৃষ্ণ ত্বক্ ত্যাগ করিলেন; দেবী কর্তৃক পরিত্যক্ত সেই ত্বক্ই দীপ্তা, ঘণ্টাহস্তা, ত্রিলোচনা নানাভরণযুক্তা পীত-কৌশেয়ধারিণী এক দেবীমূর্তি পরিগ্রহ করিল। সেই নীলমেঘবর্ণা দেবীকে ব্রহ্মা বলিলেন,—'হে রাত্রিদেবী, পার্বতীর দেহজাতা তুমি 'একানংসা' দেবীরূপে বিখ্যাত হইবে; দেবীর ক্রোধসমুদ্ভূত সিংহ তোমার বাহন হইবে—তুমি বিন্ধ্যাচলে গিয়া বাস কর।' পদ্মপুরাণ মতে এই কৃষ্ণবর্ণা দেবীই কৌশিকী। কৃষ্ণত্বক্ ত্যাগ করিবার পর হইতেই দেবী গৌরী হইলেন। স্কন্দ-পুরাণেও রাত্রিদেবী কর্তৃক দেবীকে কৃষ্ণবর্ণা করিয়া দিবার উপাখ্যান দেখা যায়।'

বাল্যলীলা—যে মহাশক্তি জগতের আধারভূতা তিনি গিরিরাজ হিমালয় ও তাঁহার পত্নী মেনকার সুকঠিন তপস্যায় প্রীত হইয়া লীলাচ্ছলে অবতীর্ণা হইলেন মেনকার কোলে পুত্রী উমারূপে। জগজ্জননীকে এইভাবে কন্যারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার অনন্ত লীলা মাধুরী বর্ণনাই শাক্তপদাবলীর অন্তর্গত 'বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়া' গানের প্রতিপাদ্য বিষয়। যশোদার অপার মাতৃস্নেহ এবং মাতৃহৃদয়ের আকূতি যেমন বৈষ্ণবপদকারগণকে বাৎসল্যরসের পদ রচনা করিবার প্রেরণা দিয়াছে শাক্তকবিগণ তেমনি মেনকার মাতৃমাধুর্য লইয়া ঐ রসের গীত রচনা করিয়াছেন।

সোনার পুতলি উমা ভারী অভিমানিনী। মায়ের কাছে সে অসম্ভব বস্তুর বায়না ধরে। তাহা না পাইয়া কান্নাকাটি করে, দাপাদাপি করে, মাকে মারিতে যায়—

অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা, ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ?
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥

মেনকার এই সস্নেহ অভিযোগ শুনিয়া গিরিরাজ কন্যাকে বুকে টানিয়া লইলেন এবং কন্যাকে এইভাবে সন্তুষ্ট করিলেন।

উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা, এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে ॥

শিশু উমা আনন্দে তখন অস্থির। অভিমানের মেঘ কাটিয়া গেল। আরসীতে মুখ দেখিয়া তাহার আনন্দ আর ধরে না।

মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি জলধরে।

অনেক কষ্টে দুরন্ত কন্যা উমাকে জননী মেনকা ঘুম পাড়াইয়াছেন। যাহাতে আবার এখনি সে জাগিয়া উঠিতে না পারে তার জন্য মায়ের সতত সতর্ক দৃষ্টি—

আর জাগাস্ নে মা জয়া, অবোধ অভয়া,
কত করে' উমা এই ঘুমাল।
মা জাগিলে একবার, ঘুমপাড়ানো ভার—
মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল।

অবশ্য এই দুরন্ত বালিকা যে জগজ্জননী স্বয়ং, শুধুমাত্র লীলার জন্যই মানুষের ঘরে আবির্ভূতা এই সত্যটি শাক্তপদকারগণ বিস্মৃত হন নাই। তাই মা মেনকার মুখ দিয়া রামপ্রসাদ বলেন—

আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী—তা নয়, তা নয়॥
স্বপ্নে যা দেখিছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্মুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয়॥

আগমনী ও বিজয়া

'আগমনী ও বিজয়া' সঙ্গীতেই স্নেহময়ী জননী মেনকার মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্যকে চিরমধুর রূপ দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালীর মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্যের রূপ জননী মেনকারূপে শাক্ত পদাবলীতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পৌরাণিক পটভূমিকায় রচিত হইলেও আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনেরই সঙ্গীত। স্বাভাবিকতার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই সঙ্গীত বাঙ্গালীর কাছে বৈষ্ণবপদাবলীর চেয়ে অনেক বেশী হৃদয়ের বস্তু। কারণ অলৌকিক জগতের সাধনার দ্বারা বাঙ্গালীকে এই রস আস্বাদন করিতে হয় নাই। ইহা তাহার আপন হৃদয় হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালী জননীর কাছে এই সঙ্গীত তাঁহার হৃদয়ের সঙ্গীত। বাঙ্গালীর ঘরের কথাই এই সকল পদে কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে শেফালিকা-গন্ধবিধুর শারদপ্রভাতে আবেগভরা করুণ রাগিণীতে এই গানগুলি যখন গায়ক গৃহে গৃহে ঘুরিয়া গাইতে থাকে তখন বাঙ্গালীর হৃদয় এক অপার্থিব আনন্দ-বেদনায় সিক্ত হইয়া উঠে।

দেখিতে দেখিতে উমা অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিলেন। দেবর্ষি নারদের পরামর্শে উমা দেবাদিদেব মহাদেবের পরিচর্যায় নিযুক্তা হইলেন। সুকঠিন 'পঞ্চতপা' করিয়া তিনি স্বয়ম্ভূকে তুষ্ট করিলেন এবং নারদের নির্দেশে গিরিরাজ মহাদেবের করে কন্যা সম্প্রদান করিয়া অসীম আনন্দ লাভ করিলেন।

কিন্তু মাতা মেনকার দুশ্চিন্তা ও দুঃখের অবধি রহিল না। অসাধ্য সাধন করিয়া যাঁহাকে লাভ করিলেন, সেই দুলালী রাজনন্দিনী আজ নিত্যভিখারীর গৃহিণী, ভাঙ্‌খোর ভোলানাথ একে বৃদ্ধ, তাহাতে ভূতগণের সঙ্গে অহরহ তাণ্ডব নৃত্যে মগ্ন। তিনি সংসারবিরাগী, শ্মশানবাসী। এহেন জামাতাকে লইয়া উমাকে সংসার করিতে হইবে ভাবিয়া মেনকা দুঃখে, বেদনায় পাগলপারা।

বিবাহের পর গৌরীকে লইয়া শিবসুন্দর উমানাথ চলিলেন স্বধাম কৈলাসে। একমাত্র কন্যাকে হারাইয়া দুঃখে, তাপে, বেদনায় মেনকা দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তৃষ্ণার্ত চাতকের মত মেনকা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, বৎসরান্তে শরৎকালে মাত্র তিনদিনের জন্য উমা কখন পিতৃগৃহে আসিবেন। বিরহাতুরা জননী মেনকার কন্যার আগমনের জন্য এই যে প্রতীক্ষোন্মাদনা, এই যে বেদনাসুন্দর আর্তি, এবং মাতা ও কন্যার মিলনে উভয়ের প্রেমসম্মিত হৃদয়চাপল্যের যে অবারিত-তরঙ্গ-ভঙ্গ, অবশেষে উমার পতিগৃহে যাত্রার কালে চির-বাঞ্ছিতকে আঁকড়াইয়া রাখিবার জন্য মেনকার যে আকুল আর্তি, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধক কবিবৃন্দ একদা যে সুরের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন সেই নির্ঝর সঙ্গীতই 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গান। বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যে ইহাই অষ্টাদশ শতকের সাধক কবি সম্প্রদায়ের নবতম অবদান।

পরমার্থলাভের যতগুলি পন্থা আমাদের শাস্ত্রে অনুমোদিত হইয়াছে তন্মধ্যে ভক্তি শ্রেষ্ঠ। মূলতঃ শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ প্রেম ও শুদ্ধা ভক্তি এক। কিন্তু জ্ঞানের রাস্তা সদর দরজায় আর ভক্তি অন্তঃপুরচারিণী। শাক্ত-পদগঙ্গায় এই ভক্তিরসের প্রবাহ নিরন্তর বহিয়া গিয়াছে বাঁধভাঙ্গা প্লাবনের মত এবং এই ভক্তিরসই বাৎসল্যের মধুর পরিণতি লাভ করিয়া দেবতার স্বর্গীয় মহিমাকে অপূর্ব মানবীয় মহিমা দান করিয়াছে। দেবাদিদেব মহাদেব এখানে জামাতা, যোগীজনবাঞ্ছিতা ব্রহ্মরূপা সনাতনী এখানে কন্যা উমা। পুরাণকল্পিত একটি কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে ঘরোয়া কাহিনীতে নবতর রূপদান, ইহাতে যেন পল্লী বাঙ্গলার শান্তরসাস্পদ গৃহাশ্রমের চিত্রটিকে নূতন করিয়া দেখা গেল।

সমাগত শরৎকাল, দিকে দিকে মাঙ্গল্যের ঘোষণা, প্রকৃতি মুখরিত, চারিদিকে মাতৃপূজার আয়োজন, দীর্ঘবিরহের পর আসন্ন মিলনের আকাঙ্ক্ষায় মেনকা আনন্দে উন্মাদিনী। কন্যার সঙ্গে মিলনের জন্য বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ে পলকে পলকে যে পুলকোচ্ছ্বাস তাহা অতুলনীয়। আনন্দে আবেগে মেনকা স্বামীকে বলিতেছেন—

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌ব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

মেনকার হৃদয়াবেগের এই যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তাহাতে এমন করিয়া সুরের সংযোজনা পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যে আছে কিনা জানিনা কিন্তু বাঙ্গালী শাক্ত কবি তাহা এমন করিয়া গাহিলেন যাহা

একান্ত বস্তুগত হইয়াও বস্তুর অতীত এক শাশ্বত ও চিরমধুর সামগ্রীতে পরিণতি লাভ করিল।

আগমনী গানের সূচনা মেনকারাণীর স্বপ্ন-দর্শনের বিবরণ দিয়া। উমাকে স্বপ্নে দেখিয়া মেনকা অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, স্বামীকে অভিযোগ জানাইতেও তিনি কুণ্ঠিতা নহেন, তিনি বলেন—

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে।
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে!
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে।

*   *   *

কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হেরি কি আনন্দ আমার
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার॥
বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে;
আধ আধ মা বলে বচন সুধাসার;
জাগিয়ে না হেরি তারে প্রাণ রাখা ভার।
গিরিরাজ, ভিখারী সে শূলপাণি, তাঁরে দিয়ে নন্দিনী
আর না কখন মনে কর একবার।
কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার।—(কমলাকান্ত)

শুধু মেনকা অভিযোগ করেন নাই, কন্যা উমাও অভিযোগ করিয়াছেন, মেনকা বলেন,—

উমা বসিয়া শিয়রে, কহিল কাতরে,
কত দয়া আর থাকিবে পাথরে,
ভিখারীর করে সমর্পণ ক'রে,
কেন তত্ত্ব ফিরে লও না মা একবার॥—(হরিশ্চন্দ্র মিত্র)

স্বপ্ন-দর্শনের মধ্য দিয়া মাতা ও কন্যার এই উক্তি প্রত্যুক্তিতে দেবী মাহাত্ম্যের কথা আমরা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাই, নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত

হইয়া উঠে দারিদ্র্যনিপীড়িত পতিগৃহবাসিনী বাঙ্গলাদেশের অভিমানিনী কন্যা উমার মধুর মানবী-মূর্ত্তি।

শাক্ত কবিরা মাতৃহৃদয়ের সুনিপুণ চিত্রকর। তাঁহারা তাঁহাদের প্রেম-সিক্ত তুলিকায় মাতৃহৃদয়ের প্রতিটি হৃদয়ানুভূতিকে এমন স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন যাহা অনুপম সৌন্দর্যে মণ্ডিত। গিরিজায়া মেনকা শুধু মাতা নহেন, তিনি কর্তব্যপরায়ণা ও সুনিপুণা গৃহিণী; শ্বশুরবাড়ী হইতে কন্যাকে আনিতে হইলে যতপ্রকার সামাজিক বিধি পালন করিতে হয় সে সম্বন্ধে তিনি সদা সচেতন, তাই তিনি স্বামীকে উপদেশ দেন আশুতোষকে 'সচন্দন বিল্বদলে ও গঙ্গাজলে' পূজা করিলে তিনি সানন্দে উমাকে পাঠাইবেন। কার্ত্তিক, গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সকলকেই আনিতে হইবে, এবং সেই সঙ্গে যথাসমারোহে জামাতাকে। উমা পূর্বজন্মে পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মেনকা স্বামীকে নির্দেশ দেন—

> আমি সেইটে করি ভয়, ঝি জামাই আনতে হয়,
> এসো কৈলাসবাসীদের সব নিমন্ত্রণ করে।

শুধু তাহাই নহে তিনি ইহাও বলেন,—

> আছে কন্যা-সন্তান যার, দেখতে হয় আনতে হয়,
> সদাই দয়ামায়া ভাবতে হয় হে অন্তরে। (রামবসু)

জননী মেনকা

পারিবারিক চরিত্রগুলির মধ্যে জননী মেনকার চরিত্রটি 'আগমনী ও বিজয়া' গীতিনাট্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র, কন্যার বিরহে চির-বিচ্ছেদের বেদনায় বিমথিত, চিরমিলনের আশ্বাসে অধীর, মেনকার হৃদয়ে বাৎসল্যের যে তরঙ্গাভিঘাত ক্ষণে ক্ষণে উঠিতেছে পড়িতেছে তাহা আমাদিগকে নিত্যসৌন্দর্যের হিমাচলপুরীর পথচিহ্নহীন

তীর্থাভিমুখে অহরহ আকর্ষণ করিতে থাকে। বস্তু ও ভাবের এই অপূর্ব সমন্বয়ে যে-অমেয় আনন্দ তাহাই তো কাব্যের প্রাণ।

মেনকার ক্ষোভের অন্ত নাই। সপত্নীর ঘরে তিনি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন, সংসার অনাসক্ত বৈরাগী মহাদেবের শিরে স্বামী-সোহাগিনী সুরধুনী গঙ্গা বিরাজমানা। এহেন সতীনের জ্বালা বালিকা উমা কত ভাবেই না সহ্য করিতেছে। কন্যার এই মর্ম যাতনার কথা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া তিনি যেমন আত্মধিক্কার দেন তেমনই স্বামীকেও গঞ্জনা দিতে ভুলেন না। গিরিরাজকে তিনি বলেন—

কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে ॥
(সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,
তুমি হে পাষাণ, তাহে না কর মনেতে ॥)(কমলাকান্ত ভট্টাচার্য)

শুধু তাহাই নহে, উমার বিহনে মেনকার যে মর্মজ্বালা তাহাও স্মরণ করিয়া তিনি স্বামীকে বলেন,—

উমার কারণে প্রাণে যে যাতনা নিশিদিনে,
(মা হ'তে বুঝিতে চিতে, ছলিতে না,—দিতে এসে।

* * *

কায়া তব পাষাণ ব'লে, অন্তরেও কি পাষাণ হ'লে?
(অমন মেয়ের মায়া ভুলে, রহিলে গিরি কেমনে?)

(মনোমোহন বসু)

স্বামীর প্রতি মেনকার এই যে সুতীব্র অভিযোগ ইহাই একান্ত ভাবে পল্লীগৃহিণীরই অভিযোগ। নারী স্বভাব-দুর্বল, নিরুপায় বলিয়াই এই অভিযোগ। তাই অনুযোগ করিয়া, কঠিন কথা প্রয়োগ করিয়াও অশ্রুমুখী মেনকা স্বামীর কাছে মিনতিতে ভাঙ্গিয়া পড়েন কন্যা আনয়নের জন্য।

কন্যা-হৃদয়ের প্রতিটি কথা, প্রতিটি ব্যথা যেমন করিয়া মাতৃহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়, এমন আর কোথাও নয়। জামাইকে ছাড়িয়া মেয়ের যে থাকিতে কষ্ট হয় ইহা একমাত্র মা-ই উপলব্ধি করিতে পারেন, তাই মেনকা বলেন,—

গিরিরাজ হে জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে।
(মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন,
পুরুষ পাষাণ তুমি বোঝনা তেমন!) (অক্ষয় চন্দ্র সরকার)

এই প্রসঙ্গে তিনি পূর্ববারের কাহিনী উল্লেখ করিয়াছেন। গতবারে জামাতাকে আনানো হয় নাই। উমাকে যখন মেনকা জিজ্ঞাসা করেন 'শিব ভাল আছেন তো'—

উমা বলে—"আছেন ভাল,"—চোখে দেয় অঞ্চল,
বলে—"চোখে কি হলো? আমার চোখে কি হলো?"
আমি বুঝিনু সকল, কেন চোখে দেয় অঞ্চল,
(হিয়ের জল ঝিয়ের চোখে উথলিল,
জামায়ের প্রসঙ্গে ॥) (অক্ষয়চন্দ্র সরকার)

এই সকল কাহিনী চিত্রণে কোথাও অতিরঞ্জন নাই। বাঙ্গালী পল্লী বধূর কোমল হৃদয়ের কোমল ধর্ম, তাহার সরল প্রাণের তরল মর্ম কবিকণ্ঠে এমন মধুর স্বরে ঝংকৃত হইয়াছে, যাহা আমাদিগকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসের সন্ধান দিয়া আমাদের চিরন্তন রস পিপাসাকে চরিতার্থ করে

গিরিরাজ হিমালয়

গিরিরাজ হিমালয় এখানে পিতা, তিনি হিমালয়ের মতই অটল, অচল, স্তব্ধ। তিনি যথার্থ ই ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির শ্বশুর। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কন্যার বিহনে অতলান্ত বিরহের যে নিত্য উতরোল তাহা

তিনি একান্তে সহ্য করিতেছেন, কোথাও তাহার প্রকাশ নাই। তাহা একান্তভাবে উপলব্ধির বস্তু। বাঙ্গালী পরিবারে নারী আবেগচঞ্চল, যুক্তিহীন। সে অধীরা, অল্পেই ভাঙ্গিয়া পড়ে; কিন্তু পুরুষ সংযত, যুক্তি-সম্পন্ন, ধীর, স্থির। গিরিরাজ চরিত্রে অনুরূপ গুণরাজি সকলই বিদ্যমান। মেনকার ন্যায় কন্যার প্রতি তাঁহার অসীম মমত্ববোধ কোনও অংশে কম নয়, কিন্তু তিনি মেনকার মত মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হন না। প্রতিবাসীরা যখন মেনকাকে—

ভূপতি পাষাণ-কায়া, দেহেতে নাই দয়ামায়া,
তুমি তাঁর বলে কি জায়া, হ'লে পাষাণী? (প্যারীমোহন কবিরত্ন)

প্রভৃতি বিবিধ বাক্যবাণে জর্জরিত করে এবং মেনকা অভিযোগে, অনুযোগে, গঞ্জনায়, অভিমানে, মিনতিতে স্বামীর কাছে ভাঙ্গিয়া পড়েন তখন শান্ত, অচঞ্চল গিরিরাজ মেনকাকে যুক্তি দিয়া প্রবোধ দেন,—

বারে বারে কহ রাণী, গৌরী আনিবারে,
জানতো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে॥
বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণিক বাঁচয়ে ফণী;
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা-মারে।
তিলে না দেখিলে ঘরে সদা রাখে হৃদি'পরে।
সে কেন পাঠাবে তাঁরে সরল অন্তরে॥ (কমলাকান্ত)

গিরিরাজ মেনকাকে প্রবোধ দিয়াই ক্ষান্ত হন না, তিনি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কন্যা আনিতে যাত্রা করেন। কিন্তু হৃদয়ে সন্দেহ, সংশয় সমস্তই আছে, 'গেলে যদি কৃত্তিবাস না পাঠান'। তবুও তাঁহাকে যাইতে হয়।

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে।
হরিষে বিষাদে, প্রমোদ প্রমাদে, ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে॥
(কমলাকান্ত)

কৈলাস-পথযাত্রী গিরিরাজের চিত্রটি একান্ত বাস্তব, কন্যাকে দর্শনের আনন্দ এবং তাহাকে আনিতে না পারিলে গিরিরাণীর কাছে কি কৈফিয়ৎ দিবেন এই সংশয়ের দ্বৈতলীলা চলিয়াছে তাঁহার অন্তরে।

গিরিরাজ বুদ্ধিমান, বিচারশীল। শয়ন-মন্দিরে কন্যাকে দেখিয়া তিনি মাতা ও ভ্রাতার দুঃখময় কাহিনী বর্ণনা করিয়া উমাকে ভুলাইতে লাগিলেন,—

চল মা, চল মা গৌরী, গিরিপুরী শূন্যাগার।
মা হলে জানিতে উমা মমতা পিতামাতার॥
তব মুখামৃত বিনে, আছে রাণী ধরাসনে,
অবিলম্বে চল অম্বে, বিলম্ব সহে না আর।

শুধু তাই নয়, উমার বিরহ-বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া ভাই মৈনাক সিন্ধু-নীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এই দুঃসংবাদটিও তিনি উমাকে দিলেন। গিরিরাজ কৌশলে কার্যসিদ্ধি করিলেন, উমাকে দিয়া হরের অনুমতি লইয়া কন্যাকে গিরিপুরে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন।

মহাদেব

গার্হস্থ্যভাব-প্রধান হওয়ায় 'লীলা' পর্বের প্রত্যেকটি চরিত্র মানবীয় ভাবে বিমণ্ডিত। দেবাদিদেব মহাদেব যিনি আপন মহিমায় সমাসীন, এখানে তাঁহার মধ্যে দেব-ভাবের লেশমাত্র নাই। কবি তাঁহাকে রক্তমাংসে গঠিত একটি পূর্ণ মানব করিয়া গড়িয়াছেন, যিনি সারাদিন ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া সায়াহ্নে উদরের জ্বালায় সিদ্ধি-রস পান করেন, যিনি নির্বিকার নিরাসক্ত, সমভাবে যোগ-ভোগে রত সেই মহাদেব এখানে উমা-গত প্রাণ। তিনি শুধুমাত্র পাগল নহেন; তিনি রসরাজ। পিতৃগৃহে যাইবার জন্য উমা অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি পরিহাস-রসিক চিত্তে অনুমতি দেন—

জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার,
আমি তব সঙ্গে যাব ; কেন ভাব আর !
আহা, আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি,
প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরি, কেঁদোনাক আর।—(ঈশ্বর গুপ্ত)

মানবী উমা

'আগমনী' পর্বে উমাচরিত্রের যে চিত্রায়ণ, তাহা সমস্ত অলৌকিকত্ব-বর্জিত হইয়া একান্ত বস্তুমুখী হইয়াছে। মুনিগণ যাঁহাকে যোগ-ধ্যানে পাননা, 'যে পদ-পঙ্কজ লাগি শঙ্কর যোগী হইয়া তাঁহাকে যতনে হৃদিমাঝে ধারণ করিয়াছেন, সেই উমা এখানে চপলা, চঞ্চলা, অভিমানিনী পল্লীবালা ও কর্তব্যপরায়ণা, পতি-সোহাগিনী পল্লীবধূ।' পতিগত-প্রাণ সতী-সাধ্বী উমা পিতৃগৃহে যাইবার জন্য স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করেন,—

গঙ্গাধর হে শিবশঙ্কর, কর অনুমতি হর,
যাইতে জনকভবনে। (কমলাকান্ত)

উমা-বিহনে উমানাথের যে কষ্ট তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত নয়। উমাকে বিদায় দিতে হইবে বলিয়া তিনি যে 'ক্ষিতি নখ-লেখনে' চিন্তান্বিত হইয়া মৌন থাকেন, ইহাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় না। তাই তিনি বলেন পিত্রালয়ে তিন দিনের বেশী থাকিবেন না। স্বামীর প্রতিটি আচার-আচরণ তাঁহার সুবিদিত।

কন্যারূপিণী উমার চিত্রটি আরও সুন্দর, আরও বাস্তব। পিতাকে গৃহাগত দেখিয়া তিনি প্রণাম করিতে যান। পতিগৃহে থাকিয়াও করুণাময়ী মেনকার অতলান্ত স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া তিনি স্বামীর কাছে আবেগ কম্পিতকণ্ঠে মনোদুঃখ প্রকাশ করেন, উমা স্বপ্নে দেখেন—

মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি, আমারে কোলেতে রাখি,
কতনা চুম্বয়ে বদনে।
জাগিয়ে না দেখি মায়, মনোদুঃখ ক'ব কায়,
বল, প্রাণ ধরি কেমনে॥

উমা শুধু চঞ্চলা নয়, উমা বুদ্ধিমতী। জননীর প্রতি তাঁহার যেমন অসীম মমত্ববোধ, তেমনই জননী যাহাতে সামান্যতম আঘাতও না পান সে সম্বন্ধেও তিনি সদা-সচেতন। স্বামীর শিরে পতিসোহাগিনী সুরধুনী আছেন বলিয়া মাতার সে অভিযোগ, সে ব্যথা অপসারিত করিবার জন্য তিনি বলেন—

শুনেছ সতীনের ভয়, সে সকল কিছু নয় মা!
তোমার অধিক ভালবাসে সুরধুনী।
মোরে শিব হৃদে রাখে, জটাতে লুকায়ে দেখে,
কা'র কে এমন আছে সুখের সতিনী। (কমলাকান্ত)

পাছে মার মনে ব্যথা বাজে, সেইজন্য উমা স্বামীর অতুল বৈভব এবং অতুলনীয় স্বামী সোহাগের কথা বলিয়া মাকে প্রবোধ দেন—

তুমি তো মা ছিলে ভুলে,
আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা, জানে না মা আমা বই। (গিরিশচন্দ্র)

চাতুরীতেও উমা কম নয়। উমা পিত্রালয়ে আসিয়াছেন। মহাদেবকে আনা হয় নাই। উমার অন্তরে দুঃসহ ক্ষোভ, মহাদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই নয়নে বেদনাশ্রু ঝরিয়া পড়ে। 'আমার চোখে কি হলো' বলিয়া চোখে অঞ্চল দেয়। এই লাজ-মধুর ছবিটি অপূর্ব। গতবারের কথা। উমা পিতৃগৃহে আসিয়াছেন, জামাতাকে আনা হয় নাই। এই বিরহ-বহ্নি কেমন করিয়া প্রকাশ করিবেন? তিনি সোনার

কার্তিককে বুকে লইয়া নাচাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গিরিরাজ দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলে কার্তিক বলিয়া উঠিল, 'মা ওমা, ও কে দাঁড়িয়ে?' উমা বলিলেন, 'তোমার দাদা, বাবা, আমার বাবা ওই।' শুনিয়া বাপ-সোহাগে বাপের ছেলে কার্তিক বলিয়া উঠিল, 'মা, আমার বাবা কই? বাবা কেন এল না, ওমা, বল না?' উমা তখন মায়ের দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন, 'কেন এলেন না, তোমার দিদি জানে!'

মা ও মেয়ের মিলন দৃশ্য ঃ

ভক্ত ও ভগবানের মিলনে সঞ্জাত যে প্রেম তাহার অভিব্যক্তির নামই লীলা। এই লীলা জমিয়া উঠে ভক্ত ও ভগবানের মান-অভিমানে। গভীর স্নেহের প্রধান লক্ষণ এই অভিমান। অভিমানই স্নেহকে গাঢ়তর করে, মধুরতর করিয়া তোলে। জননী মেনকা ও কন্যা উমার মান-অভিমানের এই মধুর লীলা 'আগমনী' অংশের সর্বত্রই লক্ষণীয়। একান্ত লৌকিকভাবে পরিমণ্ডিত হইয়াও ইহা আমাদিগকে লোকাতীত মায়ালোকে উত্তরণ করে।

উমা আসিয়াছেন। এই সংবাদে রাণী প্রেমাশ্রুতে ভাসেন। আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া ছুটিতে থাকেন 'গৌরী কত দূরে আর গো?' অবশেষে উমাকে দেখিয়া যখন বলেন, 'মা এলে, মা কি মা ভুলে ছিলে'; তখন উমা কি করেন?—

রথ হ'তে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বারবার। (রামপ্রসাদ)

সবই সুন্দর, সবই মধুময়। সম্পূর্ণ লৌকিক হইয়াও ইহা আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ। ভক্ত ও ভগবান এখানে অভেদ। এ যেন মেনকার 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।' এই চির পুরাতন অথচ চিরসুন্দর চিত্রাঙ্কনে রামপ্রসাদের দক্ষতা অতুলনীয়। উমা আসিয়াছেন—

শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।
গদগদ ভাব ভরে, ঝর ঝর্ আঁখি ঝরে, পাছে করি' গিরিবরে,
অমনি কাঁদে গলা ধ'রে ॥
পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারুমুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে ॥
(রামপ্রসাদ)

ইহার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নাই। পল্লী বাঙ্গলার দারিদ্র্য-পীড়িত সংসারে একান্ত গৃহকেন্দ্রিক, সন্তানকেন্দ্রিক, বাৎসল্যময় জীবনে আত্মভোলা সংসার-বিরাগী স্বামীর সংসারে কন্যার যে দুঃখ মাতৃহৃদয়কে সকরুণ বেদনায় ভারাক্রান্ত করে, ইহা সেই বেদনা-রঞ্জিত সুমধুর আলেখ্য।

বৈষ্ণব কবিতায় মিলনের পদ বিরহ-পদের তুলনায় তুচ্ছ; শাক্ত কবিতায় কিন্তু বিজয়া গানের অপেক্ষা আগমনী-গানের ভাব-বৈচিত্র্য ও নাট্য-সৌন্দর্য অনেক বেশী। বিজয়ায় মাধুর্যপূর্ণ লৌকিক ভাব কিন্তু আগমনী গানে মাধুর্য, ঐশ্বর্য ও বাৎসল্যের ত্রিস্রোতাপ্রবাহ নিরন্তর বিচিত্র ভঙ্গীতে তরঙ্গায়িত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

পুরবাসী বলে—"উমার মা,
তোর হারা তারা এলো ওই।"
শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
"কই উমা" বলি "কই"!

স্নেহোন্মাদিনী মেনকা, এই চক্ষে যশোদাও ভগবান বাল-গোপালকে নিত্য দেখিতেন। মানবীয় নিবিড় রস-সঞ্চারণে এই লোকায়ত জীবন কাহিনী অপূর্ব মধুর হইয়া উঠিয়াছে।

কেঁদে রাণী বলে—"আমার উমা এলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোলে।"
অমনি দু বাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কাঁদি রাণীরে বলে—
"কই মেয়ে বলে আনতে গিয়াছিলে!
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ
জেনে এলাম আপনা হতে
গেলে নাকো নিতে,
রব না, যাব দুদিন গেলে॥" (গদাধর মুখোপাধ্যায়)

'আগমনী' ও 'বিজয়া'-র পদগুলির নাটকীয় বিন্যাসটি সর্বত্রই লক্ষণীয়। জীবনের রঙ্গমঞ্চে মাতা ও কন্যার অপূর্ব অভিনয়। কন্যার সঙ্গে মিলনে মায়ের অপার সুখ, আবার মায়ের উপর কন্যার রুদ্ধ অভিমান। উভয়েই আত্মহারা। ইহাই প্রেম। অন্তহীন, অপার্থিব নিষ্কাম প্রেম, তাহার পরিণতি বাৎসল্যে। ইহাই বাঙ্গলার যথার্থ আগমনী গান। এই গানে প্রেম প্রেমময়, প্রেমিক সকলেই অভেদ, একাকার। ইহাতে প্রাণ ভরিয়া যায়, মন মাতিয়া উঠে। সুর হারাইয়া যায়, গান থামিয়া যায়।

দরিদ্র জামাতার কথা স্মরণ করিয়া যখন মেনকা খেদোক্তি করেন—

মার প্রাণে কি ধৈর্য ধরে,
জামাই নাকি ভিক্ষা করে।
এবার নিতে এলে, বলবো হরে,
উমা আমার ঘরে নাই॥ (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

এ যেমন সুন্দর, তেমনই এই সংশয় মোচনের জন্য উমা যখন বলেন—

ছিলাম ভাল জননী গো হরেরি ঘরে।
কে বলে জামাই তব শ্মশানেতে বাস করে।

* * *

ষড়ৈশ্বর্য আছে যাঁর, ভিক্ষা কি জীবিকা তাঁর?
সকলে না বুঝে সার, ভিক্ষাজীবি বলে হরে।

(অম্বিকাচরণ গুপ্ত)

ইহাও তেমনই মধুর। সতীনের করে উমাকে সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া মেনকার হৃদয়ে দুঃখের যে হোমানল নিত্য প্রজ্জলিত তাহাতে অমৃতবারি সিঞ্চন করিয়া উমা মাকে বলেন, উমা বিহনে মৃত্যুঞ্জয় মুহূর্তকাল মাত্র স্থির থাকিতে পারেন না, উমা-অন্ত-প্রাণ উমানাথের অপার ভালোবাসার কথা স্মরণ করাইয়া তিনি মাকে বলেন,—

দিতে হয় মা মুখে তুলে
নয়তো খেতে যায় গো ভুলে,
খেপার দশা ভাবতে গেলে,
আমাতে আর আমি নই॥ (গিরিশচন্দ্র)

তখন জননীর সমস্ত সংশয় দূরীভূত হইয়া যায়। ইহাই প্রকৃত গীতি কবিতা। হৃদয়ে যে অনুভূতি থাকিলে ভাষা ভাব প্রকাশের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনিই অভিব্যক্ত হয়, ইহা তাহারই নিদর্শন। ভাব, ভাষা, ও ব্যঞ্জনা সমস্তই অসীমের মাঝে হারাইয়া গিয়াছে; এখানে শুধুমাত্র অনুভূত হয় অন্তরের অন্তরতম আনন্দ।

উমা এখন বড় হইয়াছেন। বৎসরান্তে মাত্র তিনটি দিনের জন্য তিনি মায়ের কাছে আসেন। অপরিতৃপ্ত মাতৃ-হৃদয় কন্যাকে নিবিড় করিয়া পাইবার জন্য মিনতিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। মেনকা বলেন—

এসেছিস্ মা—থাক্ না উমা দিন কত।
হয়েছিস্ ডাগর-ডোগর, কিসের এখন ভয় এত?

উমা বড় হইয়াছেন বলিয়া যে ঘর-পর চিনিয়াছেন ইহাও বলিতে মেনকা বাকি রাখেন না—

এখন বুঝি ঘর চিনেছিস, তাই হয়েছি পর,
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস্, নিতে এলে হর
সঁপে দিছি পরের হাতে, জোর আমার তো নাই তত।

(গিরিশচন্দ্র)

মেনকার এই উক্তি যেমন প্রাঞ্জল, তেমনই সরস। মেনকার উক্তি আরও স্বভাব-সুন্দর হইয়া উঠে যখন তিনি উমাকে বলেন—

বোঝাব মায়ের ব্যথা, গণেশকে তোর আটকে রেখে
মায়ের প্রাণে বাজে কেমন, জান্‌বি তখন আপনি ঠেকে॥

(গিরিশচন্দ্র)

স্বল্প কথায় এমন গভীর ভাবের অভিব্যক্তি আর কোথায় আছে জানি না, কিন্তু আমাদের গীতি-কবি বিন্দুতে সেই সিন্ধুর সন্ধান দিয়াছেন।

নবমী রজনী ঃ

বহু দিনের অনিদ্র প্রতীক্ষার পর ক্ষণিক মিলনের আনন্দে মেনকার হৃদয় যখন রহিয়া রহিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, তখন সহসা নবমীর মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল। কন্যার সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়া মেনকার অশ্রু আর বাধা মানিল না। সেই সঙ্গে বিশ্বের চিরবিরহবেদনার অশ্রু-উৎস খুলিয়া গেল। সপ্তমী ও অষ্টমীর অবসান হইয়াছে। সমাগত নিষ্ঠুরা নবমী। এই নবমীর রজনী প্রভাত হইলেই হিমাচলকে ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া হৈমবতী চলিয়া যাইবেন। এই রজনীকে বিলম্বিত করিবার জন্য মায়ের কী আকুল আর্তনাদ, কী সকরুণ মিনতি

কমলাকান্ত, রূপচাঁদ পক্ষী, মাইকেল, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বহু কবি এই নবমীর রজনীকে লইয়া অপূর্ব কবিত্ব করিয়াছেন। প্রত্যেক কবিই

মেনকার মর্মভেদী হাহাকারকে তাঁহাদের নিপুণ তুলিকায় এমন করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন যাহা একান্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। প্রাণহীন রজনীর উপর প্রাণসত্তা আরোপ করিয়া তাহাকে বিলম্বিত করিবার জন্য কেহ জানাইয়াছেন সকরুণ প্রার্থনা, কেহ বা কৃতাঞ্জলি হইয়া সচন্দন-পুষ্প নিবেদন করিয়াছেন, কেহ বা একান্ত রুষ্ট হইয়া তাহাকে নিষ্ঠুর, খল বলিয়া তিরস্কার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

উমা বিনা মেনকার প্রাণ ধারণ অসম্ভব। তাই মেনকা কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেন—

রজনী জননী, তুমি পোহায়ো না ধরি পায়,
তুমি না সদয় হ'লে উমা মোরে ছেড়ে যায়।

*　　*　　*

তুমি হলে অবসান, আমি হ'ব গতপ্রাণ,
বিজয়া-গরল-পান করিয়ে ত্যজিব প্রাণ॥ (অজ্ঞাত)

জীবন মন্থন করিয়া যে ধন তিনি লাভ করিয়াছেন সেই উমাকে ছাড়িয়া মেনকা ক্ষণমাত্র বাঁচিতে পারিবেন না। মেনকার অন্তরের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া অরুন্তুদ বেদনার বাণী ঝরিয়া পড়ে—

যেও না, যেও না, নবমী রজনী,
সন্তাপহারিণী ল'য়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ী, উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হলে অবসান যাবে মেনকার প্রাণ
প্রভাত শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন জলে।

(নবীনচন্দ্র সেন)

এ কান্না দু'দণ্ডের অদেখার জন্য দু'দণ্ডের কান্না নয়; মাতৃহৃদয়ের এই বিরহের হাহাকার অনাদি অতীত হইতে অনাগত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত চিরকাল ধ্বনিত হইয়া বিশ্ব-হৃদয়কে কাঁদিয়া ভাসাইবে। শাক্ত-সাহিত্যের

পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলী অংশের মাথুর পর্বেও আমরা অনুরূপ ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। চির-কৈশোরের লীলাভূমি প্রেমের বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া নবীন মদন মথুরা যাইবেন, তাই প্রেমোন্মাদিনী রাধা রজনীকে বিলম্বিত করিবার জন্য মিনতি জানান—

সজনি, রজনী পোহাইলে কালি
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর
মন্দিরে রহু বনমালী॥
যোগিনী-চরণ শরণ করি সাধহ
বান্ধহ যামিনীনাথে।
নখতর চাঁন্দ বেকত রহু অম্বরে
যৈছে নহত পরভাতে॥
কালিন্দীদেবী সেবি তাহে ভাখহ
সো রাখই নিঅ তাতে।
কিয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব
গোবিন্দদাস অনুমাতে।

শাক্ত পদাবলীতে নবমী রজনী তাই যেন বৈষ্ণব পদাবলীর অক্রুরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। আসন্ন বিরহের আশঙ্কায় উৎসব-মুখর দিনগুলিও ম্লান হইয়া যাইতেছে। মাতৃহৃদয় হইতে পুঞ্জীভূত বেদনা ঝরিয়া পড়িতেছে। মেনকা প্রার্থনা করেন,—

যেয়ো না রজনী, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ী, এ পরাণ যা'বে।
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!

মেনকার হৃদয়-যমুনায় যে ক্রন্দন-কল্লোল তাহাকে লইয়া মধুসূদন যে কাব্যরস সৃষ্টি করিলেন, তাহা অপূর্ব এবং বঙ্গ সাহিত্যের চিরন্তন রসবস্তু হইয়া থাকিবে।

বিজয়ার করুণ দৃশ্য ঃ

বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হইতে জাত যে প্রেম ও স্নেহ তাহাই বিরহ। বিজয়া গানে উৎসারিত বিরহের এই করুণ মূর্ছনা কা[illegible]র ভিতর দিয়া মর্মে প্রবেশ করিয়া প্রাণকে আকুল করিয়া তোলে। সমস্ত বন্ধন, সমস্ত আর্তিকে যখন দলিতমথিত করিয়া নিষ্ঠুরা নবমী নিশি অবসান-প্রায়, তখন বিজয়ার গান বাজিতে আর দেরী নাই। নৃত্যপরায়ণ শঙ্করের বিশাল ডম্বরু ঘন ঘন বাজিয়া উঠিল; তিনি আসিয়াছেন, কোনমতে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবার জো নাই—হাসির চন্দ্রকলা তাঁহার ললাটে-লাগিয়া আছে কিন্তু তাঁহার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী। এত জানিয়াও উদ্দাম স্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ডের মত জীবনের একমাত্র অবলম্বন, চির-বাঞ্ছিত উমা ধনকে মেনকা আঁকড়াইয়া রাখিতে চাহেন। জীবনের বিনিময়েও তিনি উমাকে ছাড়িবেন না, মেনকার মর্মভেদী আর্তনাদে বিশ্ব-হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। মেনকা করুণ ভাবে বলেন—

> ভিখারী ত্রিশূলধারী যা চাহে, তা দিতে পারি;
> বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান।
>
> *　　　*　　　*
>
> পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠানো যায়;
> মিছে আকিঞ্চন কেন করে ত্রিলোচন! (কমলাকান্ত)

মেনকার এই বিরহার্তিকে শুধু বাঙ্গালী কবিই সঙ্গীতময়তা দান করেন নাই, যুগে যুগে, দেশে দেশে, কালে কালে বহু কবির বিরহ-গানে এই বেদনাশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ কবি সত্যই বলিয়াছেন—

'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought'.

মেনকা কখনও নবমীকে মিনতি জানান, কখনও গিরিরাজকে সকরুণ প্রার্থনা জানান—

শুনহে অচলরায়, বল গিয়ে জামাতায়,
আমি পাঠাব না উমায়, দিগম্বরে যেতে বল। (অজ্ঞাত)

আবার কখনও বা উমার সখী জয়াকে ধরিয়া বলেন—

জয়া, বলগো পাঠানো হবে না।
হর—মায়ের বেদন কেমন জানেনা ॥
তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার,
ও কথা আমারে বলো'না।

এই ক্রন্দন পল্লী বাঙ্গলার স্নেহময়ী জননীর হৃদয় ক্রন্দন। কিছুতেই তিনি কন্যাকে যাইতে দিবেন না। ইহা শুধু মেনকার ক্রন্দন নহে, প্রিয়জনকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য পৃথিবীর সর্বপ্রান্ত হইতে অনন্তকাল ধরিয়া অনাদ্যন্ত রবে এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। চির-বাঞ্ছিতের জন্য চির-পুরাতন এই ক্রন্দন।

যিনি প্রাণের প্রাণ, আপন হইতেও আপন সেই প্রাণ-কন্যা গিরিজাকে মহাদেব লইয়া যান দেখিয়া আশুতোষকে তুষ্ট করিবার জন্য মেনকা স্বামীকে মিনতি জানান—

মোর বচন ধর হে নাথ, ধর গঙ্গাধর-পায় !
ধরাতে গুণ ধরে যদি ঐ পদ-ধরায় ॥
নাথ, কিসে যাবে আর এ বেদন, ভিন্ন হর-আরাধন,
রাখিতে ঘরে তারাধন, নাহি অন্য উপায়. (দাশরথি রায়)

কি করুণ এই দৃশ্য ! এই নিখাদ অশ্রুমুক্তা একমাত্র বাঙ্গালী কবি-গানেই ঝরিয়া পড়িয়াছে।

দশমীর প্রভাত

যে অনাগতের আঘাতের আশঙ্কায় এত হা-হুতাশ, এত ক্রন্দন, এত হৃদ্-বিদারণ, জননী মেনকার মর্মস্থল হইতে হৃদয়-নিধিকে ছিনাইয়া লইবার জন্য সেই মহাকাল সমাগত। মেনকা বলেন—

বিছায়ে বাঘের ছাল দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বারেবার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ-প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার॥ (রামপ্রসাদ)

সার্থক প্রসাদী সঙ্গীত। প্রসাদের এই ভাষা আত্মার ভাষা, এ বাণী অন্তরাত্মার বাণী। মর্মজ্ঞ ইংরেজ লেখক যথার্থই বলিয়াছেন,— "Poetry is the speech of soul to soul". প্রসাদ কবি তাঁহার আন্তরিকতার ও তন্ময়তার কবোষ্ণ স্পর্শে অন্তহীন মাতৃস্নেহের যে নৈবেদ্য রচনা করিলেন তাহা অপূর্ব। কিন্তু বৃথা এ আর্তনাদ। মহাদেব 'শুনিয়া না শুনে কাণে, ঢোলে পড়ে হাসিয়ে'।

মহাকালের এই আহ্বানে উমাকে সাড়া দিতে হয় তিনি চলিয়া যান। দুঃসহ দাবানলে হৃদয় জ্বলিয়া যায়। অভাগী মেনকা চীৎকার করিতে থাকেন—

এইখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও মা!
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো॥
দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথ-পানে।
বোলে যাও, আসিবে আর কত দিনে এ ভবনে।

(কমলাকান্ত)

মায়ের অনুমতি লইয়া উমা চলিয়া যান। উমার এই আবির্ভাব যেমন সত্য, তাঁহার তিরোভাবও তেমনই সুন্দর। মেনকা নিজেকে নিজে প্রবোধ দেন 'ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু' সর্বভূতে সেই পরমা-প্রকৃতি

চৈতন্যরূপিণী ব্রহ্মরূপিণী উমার অবস্থান। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এই বিশ্ব বিরাজমান। তিনি আবাহন-বিসর্জনের অতীত হইয়াও আপন মহিমায় আপনিই আবির্ভূতা। এই মহিমার কথা স্মরণ করিয়া মেনকা বলেন—

এস মা, এস মা উমা, বলো না আর 'যাই' 'যাই'।
মায়ের কাছে, হৈমবতি, ও-কথা মা বোলতে নাই ॥
বৎসরান্তে আসিস্ আবার, ভুলিস্ না মায়, ওমা আমার।
চন্দ্রাননে যেন আবার মধুর 'মা' বোল শুন্‌তে পাই!

(জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়)

আবির্ভাব ও তিরোভাব, জীবনে উভয়ই সত্য, তাই জীবন আনন্দময় ও মধুময়। এই অন্তর্ধানই আগমনের সূচনা করে। তাই "আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তাপ লাগিল। আমাদের শরতের বিচ্ছেদবেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়, তাই ধরার আঙিনায় আগমনী-গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।" (রবীন্দ্রনাথ)

আগমনী ও বিজয়ার বিষয়গত পরিচয় ও নাটকীয় রূপ ঃ গিরিরাজ হিমালয় অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা উমাকে মহাদেবের হাতে সমর্পণ করিয়া অক্ষয় পুণ্য অর্জন করিয়াছেন। বালিকা উমা সুদূর কৈলাসে স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গেল। কন্যার বিচ্ছেদে গিরিরাজ সর্বদাই বেদনা বোধ করেন কিন্তু তাহা তিনি কখনও প্রকাশ করেন না। কিন্তু গিরিরাণী মেনকার হৃদয় সর্বদাই ব্যাকুল। সেই কবে গৌরী স্বামীর ঘর করিতে গিয়াছে, তারপর কন্যার আর কোন সংবাদই তিনি

পাইতেছেন না। গিরিরাণীর আহার নিদ্রা ঘুচিয়াছে। তিনি সর্বদাই কন্যাকে স্বপ্ন দেখেন। কন্যা যেন তাঁহাকে বারে বারে মা, মা বলিয়া ডাকে—

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে!
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে!
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে,
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু-বদনে।
মনের তিমির নাশি, উদয় হইলে আসি,
বিতরে অমৃতরাশি স্থললিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম গিরি হে!
ধৈরয না ধরে মম জীবনে॥ (কমলাকান্ত)

এই স্বপ্ন-দর্শনের পর মেনকার হৃদয় কিছুতেই আর শান্ত হইতে চাহিতেছে না। কন্যাকে অবিলম্বে লইয়া আসিবার জন্য তিনি গিরিরাজকে সর্বদাই অনুরোধ করেন। কিন্তু গিরিরাজ জানেন যে, সেই শরৎকালের শুক্লা সপ্তমীর আগে কন্যাকে জামাতৃগৃহ হইতে আনিবার উপায় নাই। তাই তিনি চুপ করিয়া থাকেন। ইহাতে মেনকার অভিমান বাড়িয়া যায়, তিনি গিরিরাজকে অভিমানভরে পাষাণ বলিয়া অভিহিত করেন—

ওহে গিরি, কেমন কেমন করে প্রাণ
এমন মেয়ে, কারে দিয়ে, হয়েছ পাষাণ॥ (ঈশ্বর গুপ্ত)

জননী মেনকার প্রাণ ধারণ করাই অসম্ভব। তাই তিনি বলেন—

বল গিরি, এ দেহে কি প্রাণ রহে আর,
মঙ্গলার না পেয়ে মঙ্গল সমাচার।
দিবানিশি শোকে সারা, না হেরিয়া প্রাণ-তারা,
বৃথা এই আঁখি-তারা, সব অন্ধকার।

খেদে ভেদ হয় মর্ম, মিছে করি গৃহে কর্ম,
মিছে এ সংসার-ধর্ম সকলি অসার। (ঈশ্বর গুপ্ত)

বারে বারেই মেনকা অশ্রুপূর্ণনয়নে গিরিরাজকে অনুরোধ করিতেছেন উমাকে আনিবার জন্য। তাঁহার কন্যা যে জগজ্জননী এবং জামাতা যে বিশ্বনাথ একথা মেনকা বিস্মৃত হন নাই। তাই গিরিরাজকে তিনি বলিতেছেন যে, গিরিরাজ যেন শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া গৌরীকে লইয়া আসেন। আর শিবও যদি আসিতে চাহেন তবে তাঁহাকে যেন বিশেষ সমাদর করিয়া লইয়া আসা হয়—

গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী
যাও হে একবার কৈলাসপুরে।
শিবকে পূজবে বিল্বদলে, সচন্দন আর গঙ্গাজলে,
ভুলবে ভোলার মন।
অমনি সদয় হবেন সদানন্দ, আসতে দিবেন
হারা তারাধন।
এনো কার্তিক গণপতি, লক্ষ্মী সরস্বতী, ভগবতী
এনো মস্তকে কোরে॥
জামাই যদি আসেন, এনো সমাদর কোরে।

মেনকা আরও উপদেশ দেন—

আমি সেইটে করি ভয়, ঝি-জামাই আনতে হয়,
এসো কৈলাসবাসীদের সব নিমন্ত্রণ কোরে।

'অচল' গিরিরাজের চৈতন্যোদয়ের জন্য মেনকা আবার বলেন—

আছে কন্যা-সন্তান যার, দেখতে হয়, আনতে হয়,
সদাই দয়ামায়া ভাবতে হয় হে অন্তরে।

তবুও মেনকার হৃদয় ধৈর্য মানে না। কারণ তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন—

আনতে যাও ঈশানী, মেয়ে দুঃখিনীর মেয়ে।
আমি দেখেছি স্বপন, যেন উমাধন
আশা-পথ রয়েছেন চেয়ে॥ (রাম বসু)

পাড়া-প্রতিবেশীরা উমাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন। তাঁহারাও আসিয়া গৌরীকে আনিবার জন্য মেনকাকে অনুরোধ করেন এমন কি কখনও কখনও অনুযোগও করিয়া থাকেন—

কি ক'রে প্রাণ ধ'রে ঘরে আছ গো রাণী!
ভবন বন হ'য়ে রয়েছে বিনা ভবানী।
আমরা যত পুরবাসী, তোমার উমায় ভালবাসি,
আনন্দেতে দেখিতে আসি দিবা-রজনী।
পাঠাইয়া উমা-ধনে, ভিখারী শঙ্কর-সনে,
পাসরে আছ কেমনে হ'য়ে জননী?

(প্যারীমোহন কবিরত্ন)

গিরিপুরে পশু-পক্ষীরা পর্যন্ত উমার অদর্শনে কাতর—

রাণি গো, শুধু তোমারি বেদনা বলে নয়।
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশুপক্ষী আদি করে,
উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময়॥

(রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়)

গিরিরাজের তো আর উমাকে আনিবার অনিচ্ছা নাই! পাষাণের বুকেও বেদনার নির্ঝর প্রবাহিত হয়। কিন্তু তাঁহাকে তো উতলা হইলে চলে না। তিনি জামাতার মন জানেন—

বারে বারে কহ রাণি, গৌরী আনিবারে।
জান তো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে॥

বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষনেক বাঁচয়ে ফণী :
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা-মারে।
তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি-পরে।
সে কেন পাঠাবে তাঁরে সরল অন্তরে॥ (কমলাকান্ত)

তবুও গিরিরাজকে যাইতে হয় মনে আশঙ্কা লইয়া—

আর কেন কাঁদ রাণি, উমারে আনিতে যাই,
গেলে যদি কৃত্তিবাস না পাঠান, ভাবি তাই।
উমার আমার অঙ্গ-ছায়া করে শীতল হরের কায়া,
পাঠায়ে কি ভব-জায়া পাগল হবেন, ভাবি তাই॥ (অজ্ঞাত)

গিরিরাজ কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উমাকে শিব ছাড়িয়া দিবেন কিনা এই ভয় তাঁহার রহিয়াছে। তিনি এক বুদ্ধি বাহির করিলেন। শিবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ না করিয়া তিনি সোজাসুজি অন্তঃপুরে কন্যার নিকট চলিয়া গেলেন এবং কন্যার কাছে গিরিপুরীর শূন্যতার কথা জানাইলেন। গিরিপুরী শূন্য, উমার জন্যে রাণী ধরাসনে শায়িত। উমার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার ভাই মৈনাক জলে ঝাঁপ দিয়াছে—

চল মা, চল মা গৌরি, গিরিপুরী শূন্যাগার।
মা হলে জানিতে উমা, মমতা পিতামাতার॥
তব মুখামৃত বিনে, আছে রাণী ধরাসনে,
অবিলম্বে চল অম্বে, বিলম্ব সহেনা আর।
তোমার বিরহ-অসি, অহরহ হৃদয়ে পশি করয়ে ছেদন,
তোমার বিচ্ছেদানল, অন্তরে হয়ে প্রবল,
সিন্ধু-নীরে প্রবেশিল মৈনাক ভ্রাতা তোমার॥

(কালীনাথ রায়)

উমার মন গলিয়া গেল। তিনি মহাদেবের কাছে পিত্রালয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—

হর, কর অনুমতি, যাই হিমালয়ে ;
জনক-জননী বিনে বিদীর্ণ হৃদয় !
এ জ্বালা কি জানে অন্যে, আমি মার একা কন্যে,
গিয়ে তিন দিন জন্যে, রব পিত্রালয় ॥ (জগন্নাথ বসু-মল্লিক)

উমার চোখে জল দেখিয়া আশুতোষ কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভার্যাকে পিত্রালয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন—

জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার ?
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর।
আহা আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি,
প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরি, কেঁদোনাকো আর। (ঈশ্বর গুপ্ত)

গিরিরাজ কন্যাকে লইয়া গিরিপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন—

গিরিরাণি, এই নাও তোমার উমারে।
ধর ধর হরের জীবন-ধন।
কত না মিনতি করি, তুষিয়ে ত্রিশূলধারী,
প্রাণ-উমা আনিলাম নিজপুরে। (কমলাকান্ত)

মা মেনকা ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু দেখিলেন তাঁহার 'প্রাণের উমা' যেন রণরঙ্গিণী বেশ ধারণ করিয়াছে, দ্বিভুজা বালিকা দশভুজা হইয়াছে। সেই দশভুজার দেহ হইতে আলোর দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে। যাহা হউক এই রূপৈশ্বর্য ক্ষণিকের। মাতা ছুটিয়া গিয়া কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন। চোখের জলে মা ও মেয়ে ভাসিতে লাগিলেন! মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ হইল। সমগ্র গিরিপুরী আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিল।

বিজয়াঃ মাতৃহৃদয়ের আকুলতা—সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিনদিন পিতৃগৃহে অবস্থান করিবার পর বিদায়ের সময় আসিল। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে দুর্গার পূজা আর দশমীতে তাঁহার বিসর্জন। দেবী সম্বৎসরে মাত্র তিনদিনের জন্য পিত্রালয়ে আসেন। চতুর্থ দিনে তাঁহাকে বিদায় দিতে হয়। দেবী গিরিপুরী ছাড়িয়া পুনরায় কৈলাস-পুরীতে গমন করেন।

নবমীর রাত্রি আসিল। কালই প্রাণের উমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। গিরিপুরী শূন্য হইয়া যাইবে। মা মেনকার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনদিন বড় সুখে কাটিয়াছে। বেদনার দুঃসহ বজ্র অকস্মাৎ উদ্যত হইয়া উঠিল। উমার কাছে বিদায়ের কথা শুনিয়াই মেনকা রোদন করিতে আরম্ভ করেন—

কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায়!
তোমরা বলগো, কি করি মা,
আমি কোন্ পরাণে উমাধনে মা হয়ে দিব বিদায়!

বিজয়ার পদগুলিতে মা মেনকার প্রাণের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। কন্যা পিতৃগৃহ ছাড়িয়া যাইবার সময় মায়ের প্রাণেই সর্বাধিক বেদনা অনুভূত হয়। উমা মাত্র এইতো আসিল, আজই সে চলিয়া যাইতে চায়। উমা নিজেও তো এখন সন্তানের জননী হইয়াছে, তবুও সন্তানের জন্য মায়ের প্রাণ কিভাবে হাহাকার করে তাহা কি সে বোঝেনা—

ছ-মাস ন-মাস নয়, এসে দশ দিনতো থাকতে হয়,—
মাগো, সে দশেতে দশমী হলে কি হবে আমার দশায়।
উমা হইল সন্তানের মাতা, মার কেমন প্রাণ বুঝলে না তা,
ওগো, পরের যে ছেলে জামাতা, এ প্রাণ কাঁদলে তার কি দায়!

(বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়)

কাল দশমীতে শিব আসিয়া উমাকে লইয়া যাইবে এই কথা ভাবিতেই মায়ের প্রাণ শিহরিয়া উঠে। কৈলাসে উমার দিন সুখে যায়না মেনকা তা জানেন। সেখানে চন্দ্র-সূর্য দেখা যায়না। চারিদিক মেঘে ঢাকা। ভূতপ্রেতের দল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উমা কাহার মুখের দিকে চাহিয়া দিন কাটায়? ভিক্ষা করিয়া শিব যদি কিছু আনিতে পারে তবে হাঁড়ি চড়ে। হায়রে! পোড়াকপাল! রাজার মেয়ে ভিখারিণী হইল। ভাঙখোর শিব তো মানুষ নয়, কে উমার দুঃখ বুঝিবে? তাই মেনকা ঠিক করিয়াছেন উমাকে তিনি আর কৈলাসে পাঠাইবেন না? কাল যখন ভোলানাথ উমাকে নিতে আসিবে তখন তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিবেন যে, উমা ঘরে নাই। যে যা বলে বলুক গিয়ে, তিনি কাহারও কথা শুনিবেন না। কন্যাপণ লইয়া তো তিনি মেয়ে বেচেন নাই? তবে এত ভয়টা কিসের—

কালকে ভোলা এলে ব'লবো—উমা আমার নাইকো ঘরে।
কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন ক'রে!
বলে বলুক যে যা বলে, মানবো না আর জামাই বলে;
যায় যাবে সে, গেলে চ'লে—যা হয় তখন দেখবো পরে।
কারু বাপের কড়ি পেয়ে, বেচে কি খেয়েছি মেয়ে,
উমা গেলে কারে নিয়ে, র'ব আর পরাণ ধরে।

(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

কিন্তু মেনকা মনে মনে জানেন নবমীর রজনী প্রভাত হইলে উমাকে ছাড়িয়া দিতেই হইবে। তাই নিরুপায় মাতৃহৃদয় নবমী রাত্রিকে অনুরোধ জানাইল যে, সে যেন শেষ না হয়। মেনকা বলেন—হে নিষ্ঠুর নবমীর রাত্রি আমি জানি তোমার মত খল আর কেহ নাই। তুমি নিজে শেষ হইয়া গিয়া আমার প্রাণবধের কারণ হইবে। তোমাকে অনুরোধ করিতেছি তুমি আমার প্রতি সদয় হও।

আমি সচন্দন প্রফুল্ল পদ্ম তোমার পাদপদ্মে অর্ঘ্য দিব। তুমি তোমার তারাদল লইয়া চলিয়া যাইও না। আমি বারোমাস ধরিয়া নিরন্তর অশ্রুবারিতে সিক্ত হইয়া তবে উমাকে আনিতে পারিয়াছি। মাত্র তিন দিন তাহাকে রাখিয়া কি মনের দীর্ঘকালব্যাপী বিরহের জ্বালা জুড়ায়? তিন দিন হইল আমার গৃহের অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, ঘরে স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে। তুমি চলিয়া গিয়া এই দীপ নিবাইয়া দিওনা। তুমি তো জান উদয়াচলে নিষ্ঠুর সূর্য উদিত হইলে আমার নয়নের মণিস্বরূপা উমাকে আমি হারাইব! তাই তুমি যাইওনা, মেনকার প্রাণবধের কারণ হইও না—

(ক) ওহে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান॥
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত—
আপনি হইয়ে হত, বধরে পরেরি প্রাণ॥ (কমলাকান্ত)

(খ) যেওনা, যেওনা, নবমী রজনি,
সন্তাপহারিণী লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হলে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে।

(নবীন চন্দ্র সেন)

মা মেনকার হৃদয়ের ব্যথা মধুসূদনের বিখ্যাত 'নবমীর নিশি', সনেটটির মধ্য দিয়া অত্যন্ত করুণ সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে—

যেয়ো না রজনি, আজি লয়ে তারাদল।
গেলে তুমি দয়াময়, এ পরাণ যাবে!
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মনি মোর নয়ন হারাবে!

বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি ; কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে ?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে।
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

কিন্তু হায়! নবমীর নিশি প্রভাত হইল। বিজয়ার দিন আসিয়াছে, মেনকার প্রাণের উমা মেনকাকে ছাড়িয়া যাইবে। এই দুঃখের ভার মেনকা কি করিয়া বহন করিবেন। দুর্গাকে পাইয়া মেনকা পুত্র মৈনাকের শোক ভুলিয়াছিলেন। এখন যদি সেই দুর্গাকেই হারাইতে হয়, তাহা হইলে জীবন ধারণ করিয়া তো কোন প্রয়োজন নাই—

পুত্র-শোকে জীর্ণ-জরা, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা,
হই যদি তারা-হারা জীবনে কি ফল বল ॥ (রূপচাঁদ পক্ষী)

গিরিপুরের সমস্ত অধিবাসীরা আসিয়া মেনকাকে অনুরোধ করে যে, তিনি যেন উমাকে যাইতে না দেন। আশুতোষ তো অল্পেতেই সন্তুষ্ট, তাঁহাকে যেন কোনক্রমে তুষ্ট করিয়া বিদায় দেওয়া হয়—

দিও না আজ উমায় যেতে, ওগো মেনকারাণী!
আশুতোষে আশু তোষে, বিদায় কর গো এখনি।
হাসি হাসি উমা এলো, কেঁদে হলো এলো থেলো,
কেন আজি পোহাইল নবমী-রজনী। (রসিকচন্দ্র রায়)

তবু যাইতে দিতেই হয়। শিব গৌরীকে ছাড়িয়া তিন দিন কোনক্রমে কাটাইয়াছেন। বিজয়ার প্রভাতেই তিনি আসিয়া উপস্থিত—

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার। (রামপ্রসাদ)

উমা যাইবার জন্য প্রস্তুত। মেনকা শেষবারের মত প্রাণাধিকা কন্যার-বিধুমুখ দেখিয়া লইতেছেন—

ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি,
অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাও গো? (কমলাকান্ত)

'মা যাই, যাই তবে', এই বলিয়া উমা মায়ের কাছে বিদায় চাহেন। মেনকার বুক ফাটিয়া যায়। মেয়েকে তিনি কি করিয়া বলিবেন 'যাও'। তাই—

এস মা, এস মা উমা, বলো না আর 'যাই' 'যাই'।
মায়ের কাছে, হৈমবতী, ও-কথা মা বোলতে নাই॥
(জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়)

গৌরী বিদায় নিলেন। কিন্তু সত্যই কি তিনি বিদায় নিলেন? উমা আসলে চৈতন্যস্বরূপিণী ব্রহ্মময়ী। তিনি এই বিশ্বের সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। ভক্তের প্রার্থনা তিনি যেন তাঁহার হৃদয়পদ্মে সর্বদা জাগিয়া থাকেন—

চৈতন্যরূপিণী তুমি ব্রহ্মময়ী,
তুমি নাই যথায় এমন স্থান আর কৈ?
তোমায় দিলে বিদায়, সকলই যে যায়;
মাগো তোমায় অবলম্বন করি এই জগৎ রয়েছে॥

আবাহন বিসর্জন নাই তোমার ;
তুমি নিত্য নিরঞ্জিনী, ভব-ভয়ভঞ্জিনী
নিত্য হৃদি-পদ্মে জাগো, পূজি হৃদি-মাঝে ॥

(হরিনাথ মজুমদার)

আগমনী ও বিজয়ার পদগুলির মধ্যে আমরা এক নাটকীয় গতি লক্ষ্য করি। বৈষ্ণব পদাবলীর বাল্যলীলা, পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের পদগুলি সাজাইলে যেমন ভাবের ক্রমোন্নতিতে একটি নাটকীয় রূপ পরিলক্ষিত হয় শাক্ত পদাবলীর মধ্যেও সেই লক্ষণ সুস্পষ্ট। কালী-কীর্তনকে অবলম্বন করিয়া যাত্রাভিনয়, গীতাভিনয় ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। শাক্ত পদাবলীর মধ্যে বিশেষ করিয়া আগমনী ও বিজয়ার গানগুলিতে নাটকীয় রস অনায়াসেই উপলব্ধ হয়।

একদিকে গিরিরাজের সংসারে গিরিরাজ, রাণী মেনকা, কন্যা উমা, উমার সখী জয়া, প্রতিবেশীবৃন্দ প্রভৃতি চরিত্রের সমাবেশ অপরদিকে কৈলাসপুরীতে স্বয়ং মহাদেব, নন্দী, ভৃঙ্গী বিবাহের পর উমা প্রভৃতি চরিত্রের সংযোজনা দ্বারা এক করুণ ও মধুর রসাত্মক নাটক জমিয়া উঠে। উমার বিবাহ, তাহার ভোলানাথ সংসারউদাসীন স্বামী, সপত্নী গঙ্গা এবং উমার দারিদ্র্যের সংসার প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া মেনকার আর দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। প্রতি মুহূর্তে মায়ের মন দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইয়া উঠে। কন্যাকে আনিবার জন্য স্বামীকে তিনি অনুরোধ করেন, অনুযোগ করেন, রাত্রির দুঃস্বপ্নের কথা অবগত করান। প্রতিবেশীরা আসিয়া উমার খবর জানিতে চায়। তাহাতে মেনকার মাতৃহৃদয়ের আকুলতা আরও বাড়িয়া যায়। গিরিরাজ স্বভাবতই ধীর, স্থির। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যার জন্য তাঁহারও উদ্বেগ কম নয়। তিনি অতঃপর উমাকে আনিবার জন্য কৈলাসে গমন করেন।

কৈলাসে পিতা-কন্যার সাক্ষাৎকারের দৃশ্য। গিরিরাজ গিরিপুরীর কথা, মেনকার আকুলতার কথা উমাকে জানান। উমা পিতৃগৃহে যাইবার জন্য মহাদেবের অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতি পাওয়া যায়।

আবার গিরিপুরীর দৃশ্য। মাতা ও কন্যার মিলন হইল। তিনটি দিন বড়ই সুখে কাটিয়া যায়। বিদায়ের লগ্ন আসন্ন হয়। নবমীর রজনী, দশমীর প্রভাত জননী মেনকার ক্রন্দনে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। দশমীর প্রভাতে মহাদেব আসিয়া উপস্থিত হন। 'গণেশের মাতা'-কে আর থাকিবার উপায় নাই। গৌরীকে বিদায় নিতে হইল। সমগ্র গিরিপুরীকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া গৌরী চলিয়া গেলেন। করুণ রসাত্মক বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকাপাত হইল।

পারিবারিক আলেখ্য—আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখের কথা অতি করুণ ও মধুর রাগিণীতে বাজিয়া উঠিয়াছে। কন্যার প্রতি পিতামাতার বাৎসল্য, তাহার বিবাহের জন্য দুশ্চিন্তা, বিবাহের পর স্বামীগৃহে কন্যার দুঃখ অথবা দারিদ্র্যের কথা ভাবিয়া মায়ের ব্যাকুলতা, কন্যাকে দেখিবার জন্য মায়ের অপরিসীম আগ্রহ বাঙ্গালীর একেবারে ঘরের চিত্র। আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি যখন করুণ সুরে গীত হয় তখন আমরা কৈলাস ও হিমালয়ের কথা ভুলিয়া যাই। আমাদের মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠে ছায়াস্নিগ্ধ পল্লীবাঙ্গালার গৃহস্থের সংসার।

কন্যার বিবাহ বাঙ্গালীর প্রতি ঘরের সমস্যা। মনোমত পাত্র পাওয়া কত কঠিন তাহা আমরা অবগত আছি। যখন বাধ্য হইয়া কন্যাকে পরের ঘরে পাঠাইয়া দিতে হয় তখন বঙ্গজননীগণ বেদনার নিদারুণ অভিঘাতে যেভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন তাহা আমাদের কাহারও অজ্ঞাত নয়। মা মেনকা কিছুতেই হেমাঙ্গী উমাকে বৃদ্ধ

জামাইয়ের হাতে দিতে চাহেন নাই। আমাদের কোন্ মায়েই বা তাহা চাহেন। কিন্তু তবু দিতেই হয়। তারপর আরম্ভ হয় সারা জীবনব্যাপী মায়ের অশ্রুবিসর্জন। দরিদ্র উদাসীন, বাউণ্ডুলে পাত্রের হাতে পড়িয়া মেয়ের কত কষ্টই না হইতেছে। মা শয়নে স্বপ্ন দেখেন—

(বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ;)
হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার,
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।
উমা বসিয়া শিয়রে, কহিল কাতরে,
(কত আর দয়া থাকিবে পাথরে,)
ভিখারীর করে সমর্পণ করে
কেন তত্ত্ব ফিরে লও না মা একবার॥ (হরিশচন্দ্র মিত্র)

মেনকা স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি পুনঃপুনঃ উমাকে আনিবার জন্য গিরিরাজকে পীড়াপীড়ি করেন। (বেদনার নির্ঝর গিরিরাজের বক্ষে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে।) তিনি কৈলাসে যাত্রা করেন। তিনি মেয়ের বাপ কাজেই যেন শত অপরাধে অপরাধী। কৈলাসে জামাইয়ের বাড়ীতে গিয়া কাহাকে কিভাবে সন্তুষ্ট করিতে হইবে মেনকা স্বামীকে সেই সব উপদেশ দিয়া দেন। শিবকে খুসী করিয়া তাঁহার অনুমতি লইতে হইবে। যদি আসিতে চাহেন তবে তাঁহাকে বহু সমাদরপূর্বক আনিতে হইবে। গিরিরাজ যেন নাতি-নাতিনীদের মাথায় করিয়া লইয়া আসেন। আর সমগ্র কৈলাসবাসীদের যেন যত্নপূর্বক নিমন্ত্রণ করা হয়। মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর কীটানুকীট ব্যক্তিও মেয়ের বাপের নমস্য। গিরিরাজের যেন এসবের কোনটিই করিতে ভুল না হয়। এসব তাঁহার কর্তব্য—

(আছে কন্যা-সন্তান যার, দেখতে হয়, আনতে হয়,
সদাই দয়ামায়া ভাবতে হয় হে অন্তরে। (রাম বসু)

গিরিরাজ আমাদের বাঙ্গালী ঘরের পিতা এবং মেনকা বাঙ্গালীর ঘরের মাতা। তাঁহাদিগকে চিনিতে আমাদের তিলমাত্র বিলম্ব হয় না। হইবার কথাও নয়। কারণ শাক্ত পদাবলীকারগণ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই সকল পদ রচনা করিয়াছিলেন। শক্তিসাধকরা কেহই গৃহবিরাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না। পরিবার তথা সমাজ সম্পর্কে তাঁহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান তাঁহাদের রচিত পদে রূপ পাইয়াছে।

সত্যই আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে কবিগণের বাঙ্গলার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কন্যার বিবাহ, স্বামী গৃহে অবস্থিতা কন্যার তত্ত্ব, জামাই ও জামাইয়ের লোকজনদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার ও লোক-লৌকিকতা করিতে হয় তাহার নির্দেশ, জামাইকে অবহেলা করিলে কন্যার মনে কিরূপ কষ্ট হয় প্রভৃতি চিত্র অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়া শাক্ত পদাবলীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক দিয়াও শাক্ত পদাবলীর আবেদন অনস্বীকার্য। মেনকা গিরিরাজকে বারে বারে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, শিবকে যেন শ্বশুরালয়ে আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া পীড়াপীড়ি করা হয়। কারণ আরেকবারের কথা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না—

আমি ভুলি নাই আরবারের কথা,
সরমে মরমের কথা, হিয়েয় আছে গাঁথা।
কার্তিকে রাখিয়া বুকে, নাচায় গৌরী থেকে থেকে,
সোণার কার্তিক তোমায় দেখে, উঠে চমকে ;
বলে তোমায় দেখিয়ে—"মা, ও মা, ও কে দাঁড়ায়ে ?"
উমা বলে—"তোমার দাদা ঐ, বাবা, আমার বাবা ঐ।"

বাপ-সোহাগে বাপের ছেলে, জড়িয়ে মায়ের ধরে গলা,
বলে—"মা, আমার বাবা কই,
বাবা কেন এলনা, ও মা বল না।"
বলে কোলে ধরে টানে, উমা চাহি আমার পানে,
বলে—"কেন এলেন না, তোমার দিদি জানে।"
আমি সেই অবধি, মরমে মরমে আছি মনোভঙ্গে॥

(অক্ষয় চন্দ্র সরকার)

আগমনী ও বিজয়া গানের পাত্র-পাত্রীরা সবই দেবতা। কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালী গৃহের মানুষগুলিরই দেবমূর্তি মাত্র—অন্তরে তাঁহারা আমাদেরই মত রক্ত-মাংসের মানুষ। দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় তাঁহার অচল ও বিরাট দেহ লইয়াও বাঙ্গালী ঘরের অশেষ ধৈর্যের প্রতীক পিতা ছাড়া আর কেহ নহেন। বিশেষ করিয়া যে-সংশয় ও দ্বিধা লইয়া তিনি কৈলাসে কন্যাকে আনিতে যান, যে-নত ভাব তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তাহা আমাদের একান্ত পরিচিত পিতৃহৃদয়ের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। মেনকা নগাধিরাজের যোগ্যা মহিষী। কিন্তু আসলে তাঁহাকে আমরা স্বামীগৃহ-গতা কন্যার সংবাদ শুনিবার জন্য, তাহাকে দুই চোখ ভরিয়া দেখিবার জন্য, কন্যার বিচ্ছেদে ব্যাকুলা বঙ্গজননী ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি না। মহাকাল শিব আমাদেরই দরিদ্র জামাতা। উমা বৃদ্ধ স্বামীর হাতে পড়িলেও ধৈর্যশীলা সুগৃহিনী। তাঁহাকে আমরা কিছুতেই কালী, করালবদনী বা দনুজসংহারিনী চণ্ডী বলিয়া ভাবিতে পারি না। সে তো আমাদেরই ঘরের আদরিণী কন্যা। বিবাহের পর আমাদিগকে চোখের জলে ভাসাইয়া পতিগৃহে যাত্রা করে। আর কৈলাস ও হিমালয় আমাদের কাছে কল্পলোকের স্থান বলিয়া মনে হয় না—তাহারা যেন বাঙ্গলার ছায়া সুনিবিড় পল্লীভূমি।

দেবী দুর্গা শরৎকালে পিতৃগৃহে আগমন করেন। বাঙ্গালী গৃহস্থের বিবাহিতা কন্যাদের পিতৃগৃহে আগমনের সঙ্গে ইহার একটি গভীর সাদৃশ্য রহিয়াছে। আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতে তত্ত্ব যাহাই থাকুক না কেন তাহা নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী মায়ের স্নেহকাতরতা ও কন্যার পিতৃগৃহে আগমনের ব্যাকুলতার মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বিজয়ায় পদগুলির একমাত্র বক্তা মেনকা। তাঁহার কন্যাবিচ্ছেদের বেদনাই এই পদগুলিতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৌরীকে ছন্নছাড়া বৃদ্ধ বরের হাতে অর্পণ করিতে হইয়াছে। প্রায়ই তিনি শোনেন যে, গৌরী অত্যন্ত কষ্টে আছে। তিনি ভাবেন—

> রবি-শশী নাহি হেরে, ঘন মেঘে রাখে ঘেরে,
> ভূত-দানা তারা সদাই ফেরে, মুখপানে তার কেবা চাবে ॥
> ভিক্ষে করে আনলে পরে, তবে হাঁড়ি চড়বে ঘরে,
> মন বোঝাব কেমন করে, কপালপোড়া কে ঘোচাবে ॥

কাজেই তিনি স্থির করেন উমাকে আর শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবেন না। উমা তাঁহার একমাত্র কন্যা। তাঁহার নিজের ঐশ্বর্যের অভাব নাই অথচ মেয়ে তাঁহার কত কষ্টই না দিন কাটায়। এই অবস্থায় মাত্র তিন দিন পরে কোন্ প্রাণে তিনি মেয়েকে বিদায় দিবেন। দরিদ্র জামাইয়ের হাতে পড়িলে মেয়ের যে ব্যথা তাহার প্রকাশ ঘরে ঘরে বঙ্গ-জননীদের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই।

সামাজিক ও ধর্মনৈতিক চেতনা—অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শাক্ত পদাবলীর বিশিষ্ট প্রকাশ। ঐ সময়ে বাঙ্গালী সমাজে কৌলীন্য প্রথার প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঐ প্রথার বলি হইয়াছে ফুলের মত কোমল ও নিষ্পাপ অগণিত বঙ্গবালিকা। কুপ্রথা ও দুর্নীতির জন্য বাঙ্গালীর মাতৃজীবনের যে শোচনীয় দুর্দশা ঘটিয়াছিল মাতৃসাধক শাক্তকবিগণ তাঁহাদের কাব্যে ঐ চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

মাত্র আট বছর বয়সে গৌরীর বিবাহ হয়। আর বিবাহ হয় এক বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য স্বামীর সঙ্গে—যে স্বামীর নাকি আরও স্ত্রী রহিয়াছে। সহস্র সহস্র বাঙ্গালী কন্যার রূপ গৌরীর মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শাক্ত কবিগণ জগন্মাতাকে বাঙ্গালী ঘরের দরিদ্র ও হতভাগিনী মায়ের কন্যা-রূপে অবতীর্ণা করাইয়াছেন। ফলে হর, পার্বতী, হিমালয় ও মেনকাকে লইয়া যে পদাবলী রচিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গালীর পরিবার ও সমাজ-জীবনের প্রতিফলন হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

কৌলীন্য প্রথার কল্যাণে বিত্তশালী পিতাও তাঁহার কন্যাকে ছন্নছাড়া পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেন। গিরিরাজকেও তাহাই করিতে হইয়াছিল। গিরিরাজ কন্যার দুঃখের কথা জানিয়াও বুকে চাপিয়া রাখিতেন। কিন্তু মেনকার বেদনা, ক্রোধ, ক্ষোভ ও আক্ষেপ ফাটিয়া পড়িত। ইহাই তো স্বাভাবিক। শিবের সংসার সম্বন্ধে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

ভিক্ষে করে আনলে পরে, তবে হাঁড়ি চড়বে ঘরে,
মন বোঝাব কেমন করে, কপাল পোড়া কে ঘোচাবে।
আপন ঝোঁকে ক্ষেপা থাকে, মানুষ নয়, বোঝাব কাকে,
সে দেখবে কি দেখবি তাকে—নিত্য ভাং ধুতুরা।

শিবের ভিক্ষা করার মধ্যে যে তত্ত্ব আছে এই সকল পদে নিশ্চয়ই তাহা ফুটিয়া উঠে নাই।

তৎকালীন যুগে সতীনের জ্বালা কন্যাদের আর এক বিড়ম্বনার কারণ ছিল। সেই যুগের সমাজ ব্যবস্থার কল্যাণে সতীনের ঘরে মেয়েকে দিয়া মায়েরা যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা সহিতেন তাহা আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

একে সতীনের জ্বালা, না সহে অবলা, যাতনা প্রাণে কত সয়েছে।
তাহে সুরধুনী, স্বামী-সোহাগিনী, সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে॥

বালিকা উমা এই যন্ত্রণা কিভাবে সহ্য করিতেছে! বাল্যবিবাহ ঐ যুগে পুণ্য কর্ম বলিয়া গণ্য করা হইত। অষ্টম বর্ষে কন্যাদান যে কোন পিতামাতার পক্ষে ভাগ্যের কথা ছিল। এই বাল্যবিবাহকেই পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত করিয়া (গৌরীদান) তাহার মহিমা বাড়ান হইয়াছে। কিন্তু এই বালিকারা বিবাহের কি বোঝে? তাইতো বঙ্গজননী মেনকা বলেন—

আঁচল্ ধরে পাছে ছোটে, ঘুমিয়ে উমা চমকে উঠে,
শ্বশুর ঘর কি জানে মোটে, কত বকি তারি তরে।

সেই দুধের মেয়ে নির্বান্ধব শ্বশুরবাড়িতে কতই না কষ্ট পাইতেছে—

উমা আমার দুধের ছেলে, কেঁদেছে 'মা' 'মা' বলে;
ও পাষাণ গিরি,
শিবের নাহিক পিতা-মাতা, কে জানিবে মায়ের ব্যথা,
কারে কবে দুঃখের কথা, আমার স্বর্ণলতা বিধুমুখী॥

ঐ সময় কন্যাপণ নামেও একটি বস্তু সমাজে প্রচলিত ছিল। এখনও সমাজের অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিবার সময় পাত্রপক্ষের নিকট পণ গ্রহণ করিবার প্রথা লক্ষিত হয়। শাক্তপদে তাহার পরিচয় আছে—

(কারু বাপের কড়ি পেয়ে, বেচে কি খেয়েছি মেয়ে,)
উমা গেলে কারে নিয়ে, রব আর পরাণ ধরে।

কিন্তু নারী চিরকালই পরনির্ভরশীলা। তাই মা মেনকার রোদন করাই সার—

কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে॥

এইভাবে আমরা দেখি শাক্তপদাবলীরূপ দর্পণে তৎকালীন সমাজের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। 'বাংলার কুটীরের বালিকাদুহিতাদের

স্বামীগৃহে যাওয়ার পর মাতৃহৃদয়ের বিরহের হাহাকারকে করুণ রসের অফুরন্ত উৎস করিয়া যে সকল আগমনী গান পল্লীতে বহিয়া গিয়াছে সেই আগমনী গীতের আদি গঙ্গা হরিদ্বার এই প্রসাদ সঙ্গীত, আশ্বিন মাসের ঝরা শিউলী ফুলের মতো এই যে মাতৃমিলনের প্রত্যাশায় বালিকা বধূদের চক্ষুজল দিবারাত্রি ঝরিত, এই সকল আগমনী গান সেই সকল অশ্রুরচিত হার—উহা তৎকালীন বঙ্গজীবনের জীবন্ত বিচ্ছেদরসে পুষ্ট।' (ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন)

কিন্তু তবুও মনে রাখিতে হইবে যে, আগমনী ও বিজয়া গানের সামাজিক বা সাহিত্যিক মূল্যই সব কিছু নয়। ইহাদের যে অধ্যাত্ম-সাধনমূল্য অর্থাৎ এই সঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়া কবিদের যে ধর্মনৈতিক চেতনার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা তুচ্ছ করিবার নহে। জগজ্জননীকে কন্যারূপে কল্পনা করা এবং তাঁহাকে সেইভাবে আরাধনা করা ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার একটি বিশিষ্ট দিক। এই সাধনার মূল রস হইতেছে বাৎসল্য রস। যশোদা-কৃষ্ণের লীলার মধ্যে এই রসের আস্বাদ আমরা পাইয়াছি। শাক্ত পদাবলীতে মেনকা ও উমার কাহিনীর মধ্যে আবার তাহা আমরা পাইলাম। অধ্যাত্মসাধনার গূঢ় রস এইভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনীর মধ্যে রূপান্তর লাভ করিল।

শক্তিতত্ত্ব

[জগজ্জননীর রূপ ; মা কি ও কেমন ; ইচ্ছাময়ী মা ; করুণাময়ী মা ; কালভয়হারিণী মা ; লীলাময়ী মা ; ব্রহ্মময়ী মা ।]

উমাসঙ্গীতে তত্ত্বের কথা থাকিলেও তাহাতে জগজ্জননীর লীলারই প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু কালীকীর্তনে শক্তির স্বরূপ এবং তাঁহার সাধনপদ্ধতির কথাই বিশেষভাবে রূপ লাভ করিয়াছে। অবশ্য এই তত্ত্ব নীরস দার্শনিক তত্ত্বের মত বিবৃত হয় নাই। [শক্তি সাধকরা দেবী কালিকাকে হৃদয়ের গভীরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। জগজ্জননীর রূপে তাঁহাদের অন্তর উদ্ভাসিত ছিল। অন্তরের সেই সুগভীর উপলব্ধিকেই তাঁহারা কাব্যে রূপ দিয়াছেন। এই কাব্যরূপ হইতেই আমরা শক্তির স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে পারি। অর্থাৎ প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে শক্তি-সাধনার যে-তত্ত্বটি প্রচলিত আছে শাক্তপদকারগণ তাহাকে তাঁহাদের কাব্যে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন।

আর্যদের প্রাচীন গ্রন্থ হইতেছে ঋগ্বেদ এবং অতঃপর অন্যান্য বেদগুলি রচিত হয়। তারপরই রচিত হয় বিভিন্ন উপনিষদ তথা দর্শনগুলি। বৈদিক সাহিত্যে পুরুষ দেবতাদেরই প্রাধান্য। সেখানে পুরুষকেই পরম কারণ স্বরূপ, বিশ্বের নিয়ন্তা ও জগতের অধীশ্বররূপে বন্দনা করা হইয়াছে। ইতস্ততঃ নারীদেবতার উল্লেখ আছে বটে, তবে তাঁহারা নিতান্তই অপ্রধান এবং পুরুষদেবতাদের ছায়াসঙ্গিনী মাত্র!

কিন্তু শাক্ততন্ত্রে মাতৃকাশক্তিরই প্রাধান্য। তিনিই সকল সৃষ্টির মূলে অধিষ্ঠিতা। সৃষ্টির আদি অবস্থায় (অর্থাৎ যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীব কিছুরই সৃষ্টি হয় নাই) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যে মহাশূন্যতা, অনন্ত ও অসীম পরিকল্পিত হয় তিনিই ব্রহ্ম বা পরতত্ত্ব। শাক্ততন্ত্রে ইহাই পরাশক্তি

বা ব্রহ্মময়ী। অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়ীতে কোন পার্থক্য নাই। 'ব্রহ্মময়ী মা' শীর্ষক পদগুলিতে শাক্তপদকারগণ এই তত্ত্বকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী বলিতেছেন—আমি একা এই জগতে বিরাজিতা, আমাকে ছাড়া আর দ্বিতীয় কেহ নাই! শক্তির এই সর্বব্যাপকত্বই তান্ত্রিকের শক্তিতত্ত্ব।

বস্তুতঃ সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতে এক অচিন্তনীয় শক্তির খেলা চলিতেছে। এই শক্তি মানববুদ্ধির অগোচর। বেদান্তের ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় এবং নির্বিকার। তাঁহার কোন ইচ্ছাও নাই কোন ক্রিয়াও নাই। এই ব্রহ্মই তন্ত্রের শিব শিবের সঙ্গে শক্তি অচ্ছেদ্যবন্ধনে যুক্ত। শিবরূপী পরমসত্তা নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার। শক্তিই তাঁহার ক্রিয়া বা প্রকাশ। এই শক্তি কিন্তু শিবের সঙ্গেই রহিয়াছেন। কাজেই বলিতে পারা যায় যে, পরমসত্তা পুরুষও নহেন, স্ত্রীও নহেন—একাধারে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ই। কিন্তু ইহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না। যেমন শক্তিমান ও তাহার শক্তি। কোন ব্যক্তিবিশেষকে যখন আমরা শক্তিমান বলিয়া জানি তখন যদিও তাহার শক্তি সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা জন্মে তবুও শক্তিমানকে বাদ দিয়া আমরা তাহার শক্তিকে কল্পনা করিতে পারিনা। 'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়। দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায়না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যরশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।' (রামকৃষ্ণ কথামৃত)

সৃষ্টির আদি অবস্থায় যে-মহাশূন্য নিরাকারকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করা হয় তিনি অদ্বৈত। এই অদ্বৈত সত্তার সহিত অর্থাৎ শিবের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে যুক্ত শক্তি হইতেই সৃষ্টির উদ্ভব। সৃষ্টিক্রিয়ার

কর্ত্রী এই শক্তিকে মহাশক্তি বা মহামায়া বলা হয়। শিব ও মহাশক্তি অভিন্ন। সৃষ্টির আদিতে শিব বা মহাশক্তি বা মহাশক্তিযুক্ত শিব শান্ত ও নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ জড় পদার্থের মত নিশ্চল হইয়া থাকেন। শক্তির স্ফুরণে শিব জড়তামুক্ত হন এবং তাঁহার মধ্যে চৈতন্যের সঞ্চার হয়। 'যখন সৃষ্টি হয় নাই; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিলনা; নিবিড় আঁধার—তখন কেবল মা নিরাকার মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন' ৮ এই মহাকালই হইতেছেন শিব। অনন্তকাল ব্যাপিয়া যে-কালস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল সেই কালস্রোতকে অর্থাৎ মহাকালকে নিরাকার অন্ধকার অর্থাৎ মহাকালী আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন—মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করিতেছিলেন। তাই ঘনান্ধকারের রূপ কালীমূর্তিতে প্রকটিত হইয়াছে। এই অন্ধকারের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত ছিল। মহাকাল ও মহাকালীর মিলনের মধ্য দিয়া সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সুরু। তারপর আবার প্রলয় ও ধ্বংস। ধ্বংসের পরই সৃষ্টির বিকাশ হয়। প্রলয়ের শেষ এবং সৃষ্টির অন্তরালবর্তী অবস্থাই কালীর মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। মহাশক্তি নিজেই ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের অর্থাৎ প্রকৃতিতত্ত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মনুষ্যদেহকে তান্ত্রিকরা শিব ও শক্তির আধার বলিয়া মনে করেন। দেহের গুহ্যমূলে মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে অবস্থিতা সুপ্তা শক্তিকে জাগ্রতা করিয়া ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করিয়া মস্তকে সহস্রদল-বিশিষ্ট পদ্মে পরম শিবের সহিত মিলন করাইয়া দেওয়াই তান্ত্রিক যোগ। এই শক্তিকে কুণ্ডলিনী বলা হয়—তিনি জটপাকানো অর্থাৎ কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় দেহে অবস্থান করিতেছেন।

বেদান্তের ব্রহ্ম আর শাক্ততন্ত্রের ব্রহ্মময়ী যে একই অদ্বৈতসত্তার ভিন্ন নামকরণ তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এই ব্রহ্মকে বা ব্রহ্মময়ীকে

দার্শনিক, সাধক ও কবিবৃন্দ নানাভাবে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। শাক্ত পদকারগণ 'জগজ্জননীর রূপ', 'মা কি ও কেমন', 'ইচ্ছাময়ী মা', 'করুণাময়ী মা', 'কালভয়হারিণী মা', 'লীলাময়ী মা', 'ব্রহ্মময়ী মা' প্রভৃতি নানারূপ ও ভাবের মধ্য দিয়া এই পরাতত্ত্বকে বিকশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

উমাসঙ্গীতের যে-উমাকে আমরা গৌরীরূপে দেখিয়াছি, যাঁহার দেহবর্ণ হিরণ্যদ্যুতি তিনিই ঘনকৃষ্ণবর্ণা কালী। কেন তিনি কালী, কৃষ্ণবর্ণ কিসের প্রতীক, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। মহাশক্তি মূলে কৃষ্ণাঙ্গী কিন্তু লীলার জন্যই তিনি হিমালয়-গৃহে গৌরীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ইহার অবশ্য অপর একটি পৌরাণিক ব্যাখ্যা আছে। ('আগমনী ও বিজয়া' অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে)।

জগজ্জননীর রূপ—ঘনান্ধকারের রূপ কালীর মূর্তিতে প্রকটিত হইয়াছে। অন্ধকারের রূপ শুধু ভাবুকের হৃদয়বেদ্য। তাই ভাবুক ভাব সমাধির জন্য এই অন্ধকারেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভীষণের মধ্যে সুন্দরের অপূর্ব সমাবেশ ঐ অন্ধকারের অন্তর্নিহিত রূপ, সব নাম ও রূপের সমাধি এই কালীতেই হইয়াছে বলিয়াই তিনি কৃষ্ণকায়া। সাধক যখন রূপাতীত অবস্থায় উপনীত হন তখনই কাল রূপ—রূপাতীত রূপ দর্শন করিতে পারেন।

(ক) শুনেছি মা'র বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
 —য়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে?

(রামপ্রসাদ)

(খ) হের হর-মনোমোহিনী, কে বলে রে কালো মেয়ে!
 আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো,
 চোখ থাকে তো দেখ্ না চেয়ে॥ (গিরিশচন্দ্র)

কালী বিবসনা। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া যিনি নিজেকে বিবর্তিত করিয়াছেন তাঁহার আচ্ছাদনের অবকাশ কোথায়? জগতে কি এমন বস্তু আছে যাহা দ্বারা অনন্তকে আচ্ছাদন করা যায়? অনন্তের যদি কোন দিক থাকে তবে সেই দিকই হইতেছে মায়ের বসন।

(ক) উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে,
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
দশ দিক্ আঁধার করে মাতিল দিক্-বসনা,
জ্বলে বহ্নি-শিখা রাঙা রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে!
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকাল তরাসে,
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরু-ভঙ্গে! (রবীন্দ্রনাথ)

(খ) যিনি বিশ্ব আবরণ, কে করে তাঁর আবরণ।
কি ছার তাঁর ভূষণ, যিনি সর্ব-নিদান॥

মা আলুলায়িত কুন্তলা! বন্ধনমুক্তা। সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিলে মাকে লাভ করা যায়না। সর্ববিধ আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া মন যখন মাতৃচরণে ধাবিত হয় তখনই বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, হৃদয়ের বন্ধন হয় তখনই শিথিল, সব সংশয়ের অবসান ঘটে।

মদ-মত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়।
নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায়॥ (গিরিশচন্দ্র)

মায়ের পদতলে শবরূপী শিব। যিনি শিব মঙ্গলময় তিনিই মহাকাল; এই মহাকালই জগতের ভক্ষক। কালেই সমস্ত বস্তুর পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিচ্ছিন্ন জগতের ইহাই সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের

আশ্রয়ীভূত। মা এই মহাকালকে পদতলে ফেলিয়া কালজয়ী কালীরূপে আবির্ভূতা। এই ভয়াল রূপের মধ্যে যিনি অভয়ের সন্ধান পাইয়াছেন তিনিই কালজয়ী হইতে পারেন। কালী নৃত্যপরায়ণা—ইহা সৃষ্টির ছন্দের প্রতীক; জগতের প্রতিটি অণু পরমাণু এই নৃত্যছন্দে গতিশীল। গতিশীলতাই প্রাণচাঞ্চল্যের বা জীবনের লক্ষণ। দেবীর নেত্রত্রয় ত্রিকালদর্শিতার দ্যোতক। আবার ইহা চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি এই তিন জ্যোতিরও প্রতীক। মা জ্যোতির্ময়ী, জ্যোতির আধার।

(ক) মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য আর হুতাশন;
কোন্ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে?

(রামপ্রসাদ)

(খ) নাচ কে রে দিগম্বরী দিগম্বর হর-হৃদিপরে।
একি অপরূপ রূপের সিন্ধু, অর্ধ-ইন্দু শোভে শিরে॥
চপলা জিনি ত্রিনয়নী, চপলা জিনি দন্তশ্রেণী,
চপলা জিনি শীঘ্রগামিনী, চপলা-রূপে আলো করে॥
অমিয়া জিনি মুখশোভা তায়, অমিয়া-সম শ্রমজল তায়,
অমিয়া-সম পিকভাষে গায়, অমিয়া-রূপে সুধাক্ষয়;
কেশরী জিনি বিক্রম জ্ঞান, কেশরী জিনি কঙ্কালী ক্ষীণ,
কেশরী জিনি নাদ সঘন, গৌরমোহন হেরি হেরে॥

(গৌরমোহন রায়)

শ্যামার দুই বাম হস্তে খড়্গ ও মুণ্ড, আবার দক্ষিণ হস্তদ্বয় বর ও অভয় দানে ব্যাপৃত। খড়্গদ্বারা অশিব অমঙ্গলকে নাশ করিয়া তাহার মুণ্ড ধারণ করিয়া অমঙ্গলের প্রতি সন্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন—দুষ্কৃতকারীর ক্ষমা নাই, কালের করাল খড়্গ তাহার স্কন্ধে পতিত হইবেই। তিনি যে শুধু দুষ্টের সংহার-কারিণীই নহেন, আশ্রিতকেও বর ও অভয় দেন—ইহাই দক্ষিণ হস্তে প্রকটিত। তিনি শ্যামা স্নিগ্ধা,

রূপের উজ্জ্বলতা নয়নবিদাহী নহে—শ্যামারূপ নয়নস্নিগ্ধকারী। দেবী কালিকার মূর্তির মধ্যে, তাঁহার রূপকল্পনার মধ্যে সৃষ্টি ও প্রলয়, উগ্র ও স্নিগ্ধ, রক্ষণ ও ধ্বংসের এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য হইয়াছে যাহা অন্য কোথায়ও দেখা যায় না।

> কে বলে কালী কাল আশীবিশ-ভূষণ—
> নাহি বাস দিক্‌বাস শব-শিব-আসন?
> অরূপা ব্রহ্মরূপিণী, শ্যামা তাই শ্যামবরণী।
> সভয়ে অভয়পাণি, কৃপাহীনে কৃপাণ॥
> যিনি বিশ্ব-আবরণ, কে করে তাঁর আবরণ!
> কি ছার তাঁর ভূষণ, যিনি সর্ব নিদান॥
> চরণেতে নহে শব, প্রকৃত এ সদাশিব,
> পরিহর ভ্রম-ভাব প্রেমিকের মূঢ় মন।
> ঘোর দৈত্য-নাশ-কালে, তব ভীম-রূপে ভুলে,
> জীবন্মুক্ত হবার ছলে করেছেন দেহ অর্পণ॥
>
> (মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)

গাঢ় অন্ধকারময় মহানিশাই শ্যামা মায়ের উপযুক্ত কাল। অমাবস্যার এই অন্ধকার—সৃষ্টির পূর্বে যে-অবস্থা ছিল তাহারই ভাবের দ্যোতক। এই অন্ধকারের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত ছিল। ধ্বংসের পরই সৃষ্টির বিকাশ হয়। প্রলয়ের শেষ এবং সৃষ্টির অন্তরালবর্তী অবস্থাই কালীর মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার পর আরম্ভ হইবে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, তাই জগজ্জননী শুধু ধ্বংসই করেন না, তিনি সৃষ্টিরও আদি জননী। ধ্বংসের বুকে দাঁড়াইয়া প্রলয়নৃত্যের ছন্দে ছন্দে কালী নবসৃষ্টির উন্মাদনায় কম্পমান।

> নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
> তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।

অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্বাণ-হিল্লোলে—হিল্লোলে,
চির-শান্তি পরিমল, অবিরল যায় ভাসি।
মহাকাল-রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি-মন্দিরে (ও মা) কে তুমি গো একা বসি!
অভয় পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে, শোভে অট্ট অট্ট হাসি! (অজ্ঞাত)

মাতৃকাশক্তিই তন্ত্রের উপাস্য। সর্বপ্রকার স্ত্রীমূর্তি এই শক্তির প্রতীক। চামুণ্ডাতন্ত্রে বর্ণিত দশমহাবিদ্যাই তন্ত্রের উপাস্য মাতৃকাশক্তির প্রধান শক্তিবৃন্দ। এই দশমহাবিদ্যা হইতেছেন—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

এই দেবীদের রূপবর্ণনাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। কোন্ ভাবের প্রতীকরূপে কোন্ দেবী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যাও তন্ত্রশাস্ত্রে রহিয়াছে। দেবী কালিকার যে-মূর্তি বর্ণনা তন্ত্রে রহিয়াছে শাক্তপদকারগণ যেন একেবারে তাহার আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। তন্ত্রে উল্লিখিত দেবীর মূল ধ্যানটি হইতেছে—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ বামাধোর্ধ্ব করাম্বুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধঃ পাণিকাম্।
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চিতাম্॥

কর্ণাবতংসতামীত শবযুগ্ম ভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্ক-মণ্ডলাকার লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্।
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তালম্বিক চোচ্চয়াম্।
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥
শিলাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন সরোরুহাম্।
এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্বকাম সমৃদ্ধিদাম্॥

অর্থাৎ দক্ষিণা কালী করালবদনা, চতুর্ভুজা, ভীষণাকৃতি ও আলুলায়িত কুন্তলা। তাঁহার গলায় নরমুণ্ডের মালা, বাম দিকের দুই হস্তের নীচের হস্তটিতে সদ্যছিন্ন মুণ্ড, উপরের হস্তে খড়্গ এবং ডানদিকের দুই হস্তের নীচের হস্তে অভয় ও উপরের হস্তে বরমুদ্রা। দেবী ঘন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা এবং তিনি দিগম্বরী। তাঁহার গলদেশে অবস্থিত মুণ্ডমালা হইতে রক্তের ধারা নির্গলিত হইয়া সর্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিতেছে। দেবীর কর্ণভূষণরূপে শোভা পাইতেছে দুইটি শবশিশু। দেবীর আকৃতি ইহার ফলে আরও ভয়াবহ হইয়াছে। দেবীর দন্তপংক্তি ভীষণাকৃতি, স্তনযুগল স্থূল ও উচ্চ, তাঁহার কটিদেশে শবনির্মিত কাঞ্চী শোভা পাইতেছে। দেবী হাস্যমুখী, তাঁহার মুখমণ্ডল ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় হইতে বিগলিত রক্তধারায় সমুজ্জ্বল। শ্মশানবাসিনী এই দেবীর কণ্ঠস্বর অতিশয় গম্ভীর। ত্রিনেত্র প্রজ্বলিত সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, দন্তরাজি উন্নত ও বহির্গত, কেশদাম দক্ষিণব্যাপি ও আলুলায়িত। তিনি শবরূপী

শিবের উপর অবস্থিতা। শিবাগণ তাঁহার চতুর্দিকে ঘোররূপে চীৎকার করিতেছে। সুপ্রসন্ন ও হাস্যবিকশিত দেবী মহাকালের সঙ্গে বিপরীত রতিতে আসক্তা।*

দেবী কালিকার এই ধ্যানমন্ত্রের সঙ্গে শাক্তপদকারগণ বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা এই ঘোরা দেবীকে তাঁহাদের পদে এই ধ্যান-মন্ত্রের অবিকল মূর্তিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই ভীষণাকৃতি দেবীর রূপবর্ণনায় বর্ধমানের মহারাজ মহাতাবচাঁদ সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার—

(ক) কে ও বিবসনা, রুধিরে মগনা, রক্তবর্ণা কার নারী।
কমল কর্ণিকোপরি, যোনিরূপা যন্ত্র হেরি,
বিপরীত রতিকারী রতি-কাম তদুপরি॥

(খ) একি রূপ নয়নে করি নিরীক্ষণ—
কে পারে স্বরূপ রূপ করিতে বর্ণন?
জিনিয়ে কোটি অরুণ অঙ্গের হেরি বরণ,
বসন তরুণারুণ তাহে সুশোভন।
উচ্চ পীন পয়োধর, তাহে বহে রক্তধার,
মুণ্ডমালা ভয়ঙ্কর গলে বিভূষণ।

(গ) কে ও একাকিনী, কাহার রমণী, শশি-শোভা জিনি
মসীবরণী।
দশনে রসনা ধরা, বদনে রুধির-ধরা, করালবদনী।
এ নব বয়সী ঘোররূপা মুক্তকেশী, শোভে দীর্ঘ বেণী
গলে দোলে মুক্তাহার, কটি-তটে নর কর রচিত কিঙ্কিণী॥
পয়োধর পীনোন্নত, রুধির-ধারে আবৃত বিকটরূপিণী।
মৃত শিশু শ্রুতিমূলে, অর্ধচন্দ্র সাজে ভালে, হেরি বিবসনী॥

* তন্ত্রসার হইতে গৃহীত।

অসি মুণ্ড বাম করে, দক্ষিণে অভয় বরে, রণে রণরঙ্গিণী।
ভীমবেশা ভয়ঙ্করী, ভব-হৃদি পদ ধরি, দক্ষিণারূপিণী॥
চতুর্দিকে শিবা ঘেরি, শ্মশানালয়ে শঙ্করী অট্ট অট্ট
হাসিনী।
চন্দ্রে দেহি এই জ্ঞান, অন্তে করি তব ধ্যান কালী
ত্রিনয়নী॥

(ঘ) রঙ্গে নাচে রণ-মাঝে, কার কামিনী মুক্তকেশী।
হৈরে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী, করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি॥
কে রে তিমিরবরণী বামা, হৈয়া নবীনা ষোড়শী।
গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি॥

—শিবচন্দ্র রায়

(ঙ) নীলবরণী, নবীনা রমণী,
নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণী
নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশানাথ-নিশাননী॥

—রামপ্রসাদ

(চ) ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে,
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব-দলে, ধরি করতলে,
গজ গরাসে॥
কে রে কালীয় শরীরে, রুধির শোভিছে, কালিন্দীর
জলে কিংশুক ভাসে।
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, অধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥

—রামপ্রসাদ

ইত্যাদি পদ দশমহাবিদ্যার তন্ত্রোক্ত ধ্যানকে অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে। তন্ত্রসাহিত্যই শাক্তপদাবলীর দেহ ও প্রাণ।

দেবীর মূর্তি সাধকের অন্তরেই রহিয়াছে। মাটির মূর্তিতে যে দেবীকে পাওয়া যাইবে না সে কথা সাধকদের অজ্ঞাত ছিল না। তাই রামপ্রসাদ বলেন—

মায়ের মূর্তি গড়তে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥

দেবীর দশমহাবিদ্যার রূপপরিকল্পনা ভাবুকচিত্তকে নানাভাবে আন্দোলিত করিয়াছে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভ্যতার ক্রমোন্নতির ধারা দশমহাবিদ্যার বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের প্রতিমূর্তিরূপে এই মাতৃমূর্তিগুলিকে ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন।

মা কি ও কেমন: ব্রহ্মময়ী মা—মহাশূন্যে আমরা অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রের মেলা দেখিতে পাই। ইহাদের যখন সৃষ্টি হয় নাই তখনকার সেই আদি অবস্থা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। সেই আদি অবস্থায় মহাশূন্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই মহাশূন্যকেই ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। সেই নিরাকার, নির্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম সম্পর্কে দার্শনিকদের মতবাদের অন্ত নাই। ইহাই পরতত্ত্ব। এই নির্বিশেষ অবস্থাকে কেহ বা ব্রহ্ম, কেহ বা কালী এইভাবে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। শাক্ত পদকারগণ এই ব্রহ্মময়ী কালীকে তাঁহাদের পদাবলীতে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। 'যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।' (রামকৃষ্ণদেব)। এই মহাকালই হইতেছেন শিব। অনন্তকাল ব্যাপিয়া যে-কালস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল সেই কালস্রোতকে নিরাকার অন্ধকার অর্থাৎ মহাকালী আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন—মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করিতেছিলেন। এই মহাকালীর অর্থাৎ মহাপ্রকৃতির নির্বিকার

অস্থাই জগজ্জননীর ব্রহ্মময়ী অবস্থা। এই ব্রহ্মময়ী মায়ের তত্ত্ব মানববুদ্ধির অগোচর। তত্ত্বের বেড়াজালে তাঁহাকে আবদ্ধ করা যায় না। তাইতো সাধক বলেন—

(ক) কে জানে গো কালী কেমন!
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন॥ (রামপ্রসাদ)

(খ) কে জানে মা তব তত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্ব-প্রসবিনী
মহত্তে ত্রিগুণ দিয়া নির্গুণা হলে আপনি।
(রসিকচন্দ্র রায়)

শিবের সঙ্গে শক্তির মিলন হইতেই সৃষ্টির উদ্ভব। এই মিলনলীলা নিত্যকাল ধরিয়া চলিতেছে। মায়ের এই লীলাবশেই নির্গুণ ও নির্বিকার শিব সগুণ ও বিকারপ্রাপ্ত হন। শিবের সহিত শক্তিরূপিণী মা হংস-হংসীর মত নিত্যলীলায় ব্যাপৃতা। (হং অর্থাৎ শিব, সঃ অর্থাৎ শক্তি)। এই রমণের আনন্দ হইতে সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিল।

অন্ধকারের বুক চিরিয়া সৃষ্টি প্রকটিত হইল—অন্ধকাররূপিণী মায়ের গর্ভ হইতে ব্রহ্মাণ্ড বহির্গত হইল।

মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥
(রামপ্রসাদ)

ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্ট জীবের দেহাভ্যন্তরে মহাশক্তি রহিয়াছেন। মানবদেহই ঐ মহাশক্তির আধার এবং এইজন্যই এই দেহের মধ্যেই সেই মহাশক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। শক্তিসাধকগণ বলেন যে, দেহের গুহ্যদেশ হইতে মস্তক পর্যন্ত সুষুম্না নামে একটি সূক্ষ্ম নাড়ী বিস্তৃত রহিয়াছে। এই নাড়ীর বিভিন্ন অংশে ছয়টি চক্র বা পদ্ম রহিয়াছে।

ঐ পদ্মগুলি হইতেছে দেহের শক্তিকেন্দ্র। সর্বনিম্ন শক্তিকেন্দ্রের নাম মূলাধার আর শীর্ষে হইতেছে সহস্রার। মূলাধারে শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সুপ্তা। তাঁহাকে জাগ্রতা করিয়া শীর্ষে সহস্রারে উত্তোলিত করিতে হইবে এবং তখনই সাধক চরমানন্দে বিভোর হইবেন। সুষুম্না নাড়ীর বাম পার্শ্বে ইড়া নাড়ী এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা নাড়ীর অবস্থান। এই নাড়ীর মধ্য দিয়াই কুণ্ডলিনী ঊর্ধ্বমুখী হইবেন।

তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন॥ (রামপ্রসাদ)

কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইয়া সুষুম্না নাড়ীর সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়া মূলাধার হইতে সহস্রারের মধ্যবর্তী ছয়টি চক্রে বা পদ্মে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

ৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস-রজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্ম সনাতনী ও মা॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম-আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল।
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা॥

(রামপ্রসাদ)

পরাশক্তির (পরমতত্ত্বের) প্রতীক কুণ্ডলিনী জীবের দেহেই অবস্থান করিতেছেন। ইনি ত্রিবৃত্তাকৃতি (ত্রিবলী) সর্পরূপে মূলাধারে সুপ্তা আছেন। ইঁহার মুখ হইতে প্রমত্ত অলির ন্যায় অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হয়। কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইয়া চক্র হইতে চক্রান্তরে উত্থিত হন আর এই গুঞ্জনধ্বনি (নাদ) ক্রমশঃ স্ফুটতর হয়। তান্ত্রিকদের মতে ইনিই

সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনিই জীবদেহে বসিয়া ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনীতে বিচিত্র চিত্তবিনোদন সঙ্গীত রচনা করিতেছেন। এই সঙ্গীতে বিশ্বভুবন মুগ্ধ—

ভুবন ভুলাইলি মা, হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে, বীণাবাদ্যবিনোদিনী॥
শরীর শারীরযন্ত্রে, সুষুম্নাদিত্রয় তন্ত্রে।
গুণভেদ মহামন্ত্রে, তিন গ্রাম-সঞ্চারিণী॥
আধারে ভৈরবাকার, ষড়দলে শ্রীরাগ আর।
মণিপুরেতে মহ্লার, বসন্তে হৃৎ-প্রকাশিনী॥
বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুর
তান নয় মান সুরে, ত্রিসপ্ত সুর ভেদিনী॥
মহামায়া মোহ-পাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে।
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী॥

(মহারাজ নন্দকুমার)

যখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় নাই তখনকার সেই নিরাকার মহাশূন্যই মহাকালী। এই মহাশূন্যকে আবার ব্রহ্ম, বৈষ্ণবমতে ব্রহ্মের লীলাময়-রূপ কৃষ্ণ ইত্যাদি নানাভাবে কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ যিনি কালী তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কৃষ্ণ—কাহারও সঙ্গে কাহারও কোন প্রভেদ নাই। একই পরমার্থের বিভিন্ন রূপকল্প মাত্র। এই সত্যকে শাক্ত পদকারগণ সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যেমন—

জান না রে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজ-তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥

ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন-পালন লয়।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ ভব-যাতনা সয়॥
যে রূপে যে জনা করয়ে ভাবনা, সে রূপে তার মানস রয়।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে কমল মাঝারে করে উদয়॥

(কমলাকান্ত)

এই তত্ত্ব যে জানে না শাক্তদের মতে সে জ্ঞানহীন—

(ক) রেখেছ নিখিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে;
আবার আপনি খেল সে বাজারে পুরুষ-প্রকৃতি হয়ে,
মিছে পৃথকভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে॥
ও মা সর্বজীবে তুমি শিবে মাতৃরূপা হয়ে পাল
আবার ভার্যারূপে ব্রহ্মময়ি, তুমি প্রণয়ের খেলা খেল।

(গোবিন্দ চৌধুরী)

(খ) কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি।
নিজ-তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী॥

(রামপ্রসাদ)

এই অভেদ-তত্ত্ব সকলে বুঝিতে পারে না। যাঁহাকে মা কৃপা করেন তিনিই শুধু বুঝিতে পারেন—

অভেদ ভাব রে মন কালা আর কালী।
মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী॥
কালী কি কালা বলিলে, কালে ছোঁয় না কোন কালে,
কালের কর্ত্রী কালী সেই, কালা আমার মা কালী॥

কভু শিব, কভু শক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা-মূর্তি, কভু কাল, কভু যে কালী।
অপার লীলা বুঝিতে, কে পারে এ ত্রিজগতে,
হন উদয় যার হৃদেতে, সে জানে এক সকলি ॥

(রামলাল দাস দত্ত)

মায়ের এই তত্ত্ব বা নিরাকারা অবস্থা সাধকের কল্পনায় আসিতে চায় না। তাই সাধক মাকে বলেন, 'মা, তুমি বসন পর, সীমার বন্ধনে ধরা দাও'। সাধকের মনে এই প্রশ্নও জাগে, 'মা, যখন এই ব্রহ্মাণ্ড তুমি সৃষ্টি করনি, জীবের সৃষ্টি হয়নি, তখন মুণ্ডমালা কোথায় পেয়েছিলে'? কিন্তু কে মায়ের মহিমা বুঝিতে পারে? মায়ের লীলা অপার—

জননী, জগৎমোহিনী, জীব-নিস্তারিণী ;
ও মা তোমারি মহিমা, কে করিবে সীমা
অনাদ্য তুমি মা অনন্তরূপিণী ॥
তোমারি মায়াতে ব্রহ্মাণ্ড-বিকাশ,
বিশ্ব বায়ু বারি বহ্নি কি আকাশ,
যেখানে যা দেখি তোমারি প্রকাশ—জননী গো—
সত্তারূপে তুমি জ্ঞানদায়িনী ॥ (কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন)

ইচ্ছাময়ী মা ও লীলাময়ী মা—আমরা জানি তন্ত্রমতে শিব স্তব্ধ, নিষ্ক্রিয় এবং নির্বিকার। শক্তিযুক্ত হইলেই শিবের জড়ত্ব কাটিয়া যায়। তখন নির্গুণ শিব সগুণ হইয়া উঠেন। শিবের মধ্যে মহাশক্তি যতক্ষণ প্রসুপ্তা থাকেন ততক্ষণ শিব স্পন্দনহীন আবার মহাশক্তিই শিবকে জাগ্রত করিয়া তোলেন। অর্থাৎ মহাশক্তির প্রভাবে শিবের জড়ত্ব প্রাপ্তি ঘটে আবার মহাশক্তিই তাঁহাকে জাগ্রত করেন। ইহাই মহাশক্তির লীলা বা মায়া। তাই মহাশক্তিকে বলা হয় মহামায়া।

এই শক্তিকে শিবের ইচ্ছাশক্তিও বলা হয়। বৈষ্ণব দর্শনে ইহাকেই যোগমায়া বলা হইয়াছে।

শিবের ইচ্ছাশক্তির অর্থাৎ মহামায়ার বিচিত্র ইচ্ছা হইতেই লীলার প্রকাশ। কেন যে তিনি লীলাচ্ছলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার লীলার রহস্য কি তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। এই লীলাতত্ত্ব অচিন্তনীয়। মহামায়া একাধারে অবিদ্যা ও বিদ্যা। অবিদ্যার প্রভাবে তিনি জীবকে মোহগ্রস্ত করেন, কলুর বলদের মত ঘোরান আবার তিনিই বিদ্যারূপে জীবের মুক্তি ঘটান। অর্থাৎ বন্ধন ও মুক্তি এই দুইয়ের মূলেই রহিয়াছেন মহামায়া। তাই সাধক মহামায়াকে অর্থাৎ মহাশক্তিকে ইচ্ছাময়ী ও লীলাময়ীরূপে আরাধনা করিয়াছেন।

শ্যামা মায়ের ইচ্ছার পরিমাপ কে করিতে পারে? তাঁহার ইচ্ছায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, মূক সরব হইয়া উঠে। তাঁহারি ইচ্ছায় এই সংসারে কেহ প্রভুরূপে, কেহ বা দাসরূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু অহং বোধ মানুষকে এই সত্য লাভ করিতে দেয় না। মানুষ মনে করে যে, সে নিজেই বুঝি সকল কাজের কর্তা। আসলে সে যে যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র মাত্র তাহা সে সহজে বুঝিতে চায় না। সাধক এই সত্য অন্তরে উপলব্ধি করিতে চাহেন—

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে 'করি আমি'।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি;
কারে দেও মা ইন্দ্রত্ব-পদ, কারে কর অধোগামী॥
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি;
তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারের সার তুমি॥

(রামদুলাল নন্দী)

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হইবার উপায় নাই। জীব যেন তাঁহার হাতের ঘুড়ি। সংসারের মায়ায় এবং কুহকিনী আশার ছলনায় জীব সংসারি বন্ধন হইতে মুক্তি পায় না। মা যেন মায়া-দড়িতে বাঁধিয়া আশাবায়ুতে এই ঘুড়ি উড়াইতেছেন। সুতা কাটিবার উপায় নাই। কারণ বিষয়-বাসনা রূপ মাঞ্জায় সুতাকে বড়ই কর্কশ করা হইয়াছে। নিতান্ত ভাগ্যের জোর থাকিলে, মায়ের কৃপা হইলে দুয়েকটা ঘুড়ি সুতা কাটিয়া চলিয়া যায়—

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি,
ভব-সংসার-মাঝারের মাঝে।
ঐ যেন মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ॥
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুটা-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি ॥
(রামপ্রসাদ)

মা লীলাময়ী। ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছার বিচিত্র প্রকাশই তাঁহার লীলা। এই বিশ্বভুবন তিনি লীলার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অপার লীলারহস্য আমরা বুঝিতে পারি না। তাই তো সাধক বলেন—

এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা ॥ (রামপ্রসাদ)

জীব সংসারে মায়ার জালে জড়াইয়া পড়ে। যিনি এই মায়ার জাল বিস্তার করিয়াছেন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া সেই মহামায়াকে ধরিতে পারিলেই জীবের বন্ধন মুক্তি। লীলাময়ী মা একদিকে যেমন বন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছেন আবার অপরদিকে তেমনই মুক্তিদান করিতেছেন।

কাজেই তাঁহাকে অর্থাৎ সেই পরমার্থকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিলেই সর্ববন্ধনের অবসান হইবে। অন্যথায় জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রবেশ করিয়া অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে—

ও মা কালী চিরকালই সং সাজালি সংসারে।
এ সং-সাজায়ে নাইকো মজা, সাজা পাই যে অন্তরে॥
ও মা কভু ভূতলে আনিলে, কভু ব্যোম রসাতলে,
কভু বারিধি-সলিলে সাজাও নানা আকারে॥
আমি ভ্রমিয়া অশেষ দেশ ধরিলাম অশেষ বেশ,
তবুও না হল শেষ—বলিহারি মা তোমারে।
প্রেমিক বল্‌ছে, আমার মন যে পাজি,
তাইতো প্রলোভনে মজি।
নইলে তোমার এ কারসাজি খাটিত কি বারে বারে।

(মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—'প্রেমিক')

সত্যই মায়ের কি বিচিত্র লীলা! মায়ের পদতলে শিব শায়িত। মনে প্রশ্ন জাগে—

শিব যদি মা তোমার স্বামী, লোটায় কেন পদতলে?
বুক পেতে দে' ভয়ে ভয়ে, চায় মা তোর মুখমণ্ডলে! (গিরিশচন্দ্র)

আবার মনে হয় কি করিয়া কালী স্বামীর বুকে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন—

পতি-নিন্দা শুনে যে মা, প্রাণ ত্যজেছেন যজ্ঞস্থলে।
সেই সতী মা কি রাখতে পারেন, পতিদেবে চরণ তলে?
পঞ্চতপা করেছেন মা, রাখি যায় সহস্রদলে,
পতির বুকে দাঁড়ায়ে তিনি, বল্‌লে তুমি কিসের বলে?

পরম মঙ্গলময় শিবও প্রলয়কালে মহামায়াতে লীন হইয়া যান। আসলে মহামায়ার আবার স্বামী কে? তিনি মহাকালকে আবৃত

করিয়া রাখেন। তিনি অদ্বয়, অক্ষয়। তিনিই পরাশক্তি। তবে তাঁহার আবার কালীরূপে লীলার অর্থ কি? এই রহস্য একমাত্র যোগীরাই হয়ত উদ্ঘাটন করিতে পারেন। অন্যের পক্ষে ইহার রহস্য বুঝা অসম্ভব। মা নির্গুণা, তবুও তিনি লীলার জন্য গুণময়ী হইতেছেন। তিনিই নির্গুণ ও সগুণে অর্থাৎ পরমার্থ (জগজ্জননী স্বয়ং) ও তাঁর সৃষ্টিতে দ্বন্দ্ব করিতেছেন। তাঁহার সৃষ্টি তাঁহাকে ধরিতে চায়, কিন্তু তিনি ধরা দেন না। তিনি নির্গুণা কিন্তু সগুণা হইয়া নিজেই সৃষ্টি রূপে বিকশিত হইতেছেন।

জীবের দেহের মধ্যেও তাঁহার লীলার প্রকাশ ঘটিতেছে। তিনিই এই দেহরূপী যন্ত্রে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া ইহাকে ঘুরাইতেছেন। ভক্তির বন্ধনে এই দেহ যন্ত্রে তিনি বাঁধা থাকেন এবং এইজন্যই যন্ত্রের আদর; অন্যথায় ইহা আপদ বিশেষ আর ছাড়া আর কিছুই নয়—

শ্যামা মা কি এক কল করেছে, কালী মা কি এক কল করেছে!
এই চোদ্দ পোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে॥
আপনি থাকি কলের ভিতরে, কল ঘুরায় ধরে কল-ডুরি,—
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে।
যে কলে জেনেছে তাঁরে, কল হতে আর হবে না তারে।
কোন কলের ভক্তি-ডোরে, আপনি শ্যামা বাঁধা আছে॥
যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল স্ববলে রয়।
কমল বলে, কালী গেলে, কেউ না যায় সেই কলের কাছে॥

(কমলাকান্ত)

এই লীলাময়ীর লীলায় সাধকের চিত্ত ভরপুর। তাই সাধক বলেন—

অচিন্ত্য অব্যক্তরূপা গুণাত্মিকা নারায়ণী।
কভু ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কাল-কামিনী॥

সাধকের বাসনা পূরাও হয়ে নানা রূপধারিণী।
কভু কমলের কমল থাক পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী॥ (অজ্ঞাত)

করুণাময়ী মা; কালভয়হারিণী মা—জগজ্জননী পরম করুণাময়ী। কিন্তু তাঁহার রূপকল্পনার মধ্যে ভীষণতার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কালী করালবদনী, নৃমুণ্ডমালিনী, খর্পরধারিণী। তাঁহার এই ভীষণ মূর্তির দিকে তাকাইলে তিনি যে করুণাময়ী তাহা তো মনে হয় না। কিন্তু আসলে তিনি মর্ত্যের জননীর মত স্নেহময়ী। জগতের কোটি কোটি সন্তানের জন্য তাঁহার উদ্বেগের অন্ত নাই। তবে যে তিনি ভীষণদর্শনা, ভীমকান্তি ধারণ করেন তাহা সন্তানের মঙ্গলের জন্যই। মহিষাসুরকে তিনি বধ করিয়াছিলেন শুধু তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য নয়। তাঁহার অস্ত্রাঘাতে পাপমুক্ত হইয়া যাহাতে সে স্বর্গে গমন করিতে পারে ইহাই ছিল মায়ের ইচ্ছা। সর্বভূতে মা করুণারূপে অধিষ্ঠিতা। সন্তানের মঙ্গলের জন্যই তিনি তাঁহাকে তাড়না করেন, ভীষণ মূর্তি ধারণ করেন। ভক্ত একথা জানেন বলিয়াই মায়ের দেওয়া দুঃখকে মাথায় বরণ করিয়া নেন—

বার বার যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
সে কেবল দয়া তব, জেনেছি গো দুঃখহরা।
সন্তান-মঙ্গল-তরে, জননী তাড়না করে,
তাই বহিতেছি সুখে, শিরে দুঃখের পশরা।
তুমি গো দীন-তারিণী, শরণাগতপালিনী
আমি ঘোর পাতকী বলে, তোমারে হয়েছি হারা।
(রামলাল দাস দত্ত)

করুণার স্রোত জগজ্জননী হইতেই প্রবাহিত। বিশ্বের তাবৎ সৃষ্ট প্রাণী এই করুণাধারায় নিত্য অবগাহন করিতেছে—

মা তোমা নিদয়া বলে কোন্ জন নিন্দা করে!
তোমারই করুণামৃতে ভুবন জীবন ধরে।
মাতৃবক্ষে স্তন্য-সিন্ধু তোমারি করুণা-বিন্দু,
অন্নপানে নেহারি তোমারে। (পঞ্চানন তর্করত্ন)

সন্তানের চিন্তায় মায়ের চোখে নিদ্রা নাই। তিনি নিদ্রিত সন্তানের শিয়রে বসিয়া স্নেহদৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে রক্ষা করেন—

কে তুমি শিয়রে বসে জাগিতেছ গো জননি।
নিদ্রা নাই কি মা—তোর চোখে, ও প্রসন্নবদনি?
সকলেই মা এ জগতে, অচেতন ঘোর নিদ্রাতে,
সুষুপ্ত সন্তানের কাছে, কেন তুই মা একাকিনী?
(পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়)

সন্তান কত দোষ করে। সেই সকল দোষ মা ছাড়া আর কে সহ্য করিবে, কে-ই বা ক্ষমা করিবে—

কুপুত্র কই আমার মত?
কেবল তুই 'মা' বলেই মা সহিস্ এত! (প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়)

এই যে করুণাময়ী মা, ভক্ত তাঁহাকেই অনুক্ষণ হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে চাহেন। তিনি উপলব্ধি করেন—

ভীমকান্ত তব আস্যে বিশ্বব্যাপী অট্টহাস্যে,
তাতেও কৃপা-মাধুরী নিঝরে।
এমন করুণাময়ী কে আছে মা বিশ্বময়ী,
তোমা সম ভুবন-ভিতরে॥ (পঞ্চানন তর্করত্ন)

করুণাময়ী মা কালভয়হারিণীও বটে। মায়ের চরণে আশ্রয় নিলে মহাকালের অর্থাৎ মৃত্যুর ভয় আর থাকে না। মানুষ মৃত্যুকেই সর্বাধিক ভয় করে। কারণ ইহকালের সব কামনা মৃত্যুর মধ্যে লয় পায়। সৃষ্টির আদি হইতেই এই মৃত্যুকে জয় করিবার সাধনা মানুষ করিয়া আসিতেছে।

আত্মা অবিনশ্বর, তাই দেহের বিনাশ হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মা মৃত্যুর মধ্য দিয়া নব নব লোকে গমন করে। এবং নব নব দেহ ধারণ করে। এই দার্শনিক সত্য উপলব্ধ হইলে মৃত্যুকে আর বিভীষিকা বলিয়া মনে হইবে না। মনে হইবে, 'জন্ম-মৃত্যু এক বৃন্তে দুটি ফুল'।

এই পৃথিবীতে ধ্বংস ও সৃষ্টির খেলা চলিতেছে। ফুল হইতে ফল, ফল হইতে বীজ, বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে গাছ, আবার ফুল, ফল ইত্যাদি—এইভাবে সৃষ্টি ও ধ্বংস আবর্তিত হইতেছে। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এই আবর্তনের স্রোতে বুদ্বুদের মত উত্থিত হইতেছে আবার পরক্ষণেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে। এই যে গতি স্রোত ইহাই মহাকাল। এই মহাকাল সব কিছুর সংহারক। কালী এই মহাকালকেও রুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন। তিনি একদিকে যেমন মহাকালে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে প্রবাহিত করান, ধ্বংস ও সৃষ্টির খেলায় নিযুক্ত করেন, আবার ইচ্ছা করিলে তিনিই তাঁহাকে সংহার করিয়া, তাঁহার গতি রুদ্ধ করিয়া ধ্বংস ও সৃষ্টির অতীত অবস্থায় লইয়া যাইতে পারেন। কাজেই কালীকে অর্থাৎ সেই পরাতত্ত্বকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিলে আর মৃত্যুভয় থাকিবে না, কালের অতীত অবস্থায় উপনীত হওয়া যাইবে। তাই কালী হইতেছেন কালভয়হারিণী। তাঁহার চরণে শরণ নিলে নির্ভীক কণ্ঠে বলা যায়—

> ভয় কি শমন তোরে,
> এলোকেশী শ্মশানবাসী যার হৃদে বিরাজ করে।
> 'কালী' 'কালী' বলবো সদা, পারবি না তায় দিতে বাধা,
> কালী-নামে মেরে ডঙ্কা, যমের শঙ্কা রাখবো দূরে॥
> যমের তলব আসবে যখন, কালী-সহি-চিটি দেখবে তখন,
> চিঠির মর্ম পেলে পরে, আস্তে আস্তে যাবে ফিরে।

(নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী)

রাজার নিজস্ব খাস তালুকে যে প্রজা বাস করে রাজার কর্মচারীদের সাধ্যও নাই তাহার গায়ে হাত দেয়। ভক্ত সাধক ক্ষেমা মায়ের তালুকে আশ্রয় পাইয়াছেন, ক্ষেমঙ্করী তাঁহার রাজা। কাজেই সেই রাজার কর্মচারী যমকে তিনি আর ভয় করিবেন কেন? তিনি তাঁহাকে পরিষ্কার বলিয়া দিবেন—

আমি তোমার কি ধার ধারি,
শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি। (মৃজা হুসেন আলী)

কালভয়হারিণী মাতা চিরানন্দময়ী। তাঁহার আনন্দের স্রোতে যে নিজেকে ভাসাইতে পারিয়াছে সে সর্বপ্রকার দাবদাহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া চিরশীলতার স্পর্শ পাইয়াছে। তাই তাহার কাছে মৃত্যু, মৃত্যুযন্ত্রণা সব কিছু তুচ্ছ—

মা আমার আনন্দময়ী, আমি নিরানন্দে যাব কেনে!
তাঁর আনন্দ-সাগরের জলে ডুবেছি শীতল জেনে।
(কেদারনাথ রায়)

সাধনতত্ত্ব

বহু শাক্তপদাবলীতে শক্তি উপাসনার গূঢ় তথ্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। কাজেই শক্তিসাধনা তথা তান্ত্রিক সাধনার তথ্য সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা না থাকিলে ঐ সকল পদের মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হইবে না। শাক্ত পদাবলীর 'ভক্তের আকুতি', 'মনোদীক্ষা', 'মাতৃপূজা', 'সাধন-শক্তি', 'নাম-মহিমা' এবং 'চরণতীর্থ' শীর্ষক পদগুলিতে সাধনতত্ত্বের কথাই নানাভাবে বলা হইয়াছে। শক্তি সাধনার এই তত্ত্ব কি?

এই জগৎ একদিকে যেমন মানুষকে নানা সুখের উপাদান যোগাইতেছে অন্যদিকে বহুবিধ দুঃখ তাহাকে প্রতিনিয়ত পীড়ন করিতেছে। প্রাকৃতিক,

দৈহিক, মানসিক এই তিন দিক দিয়াই মানুষ বিপদের সম্মুখীন হইতেছে। শুধু মাত্র দৈহিক বা মানসিক শক্তি দিয়া এই সকল দুঃখকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে। ইহার জন্য প্রয়োজন এমন এক শক্তির উদ্বোধন যাহা হইবে অসাধারণ ও দেহাতিরিক্ত। এই শক্তি দেহের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। ইহাকে উদ্বুদ্ধ বা জাগ্রত করিতে হইবে। কিন্তু কি ভাবে? যে প্রক্রিয়া অবলম্বনে শাক্ত সাধকগণ এই শক্তির উদ্বোধন করেন তাহাই তাঁহাদের সাধনতত্ত্ব।

এই বিশ্বজগতের সৃষ্টির রহস্যটি কি? কোথা হইতে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের সৃষ্টি হইল? এই মৌলিক জিজ্ঞাসাগুলি দার্শনিকদের মত শক্তিসাধকদের মনেও উদিত হয়। গভীর চিন্তার ফলে এই জিজ্ঞাসা-সমূহের উত্তরও তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে এক পরম সত্য নিহিত রহিয়াছে। এই সত্যই ব্রহ্ম, তান্ত্রিকের নিকট ইনি ব্রহ্মময়ী কালী। এই ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিকার এবং নিষ্ক্রিয়। বেদান্তমতে ইনিই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। তবে যে জগৎকে আমরা দেখি তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাত্র অর্থাৎ মায়া। কারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেই এই জগতের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। আমরা যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতে পারি (যোগসাধনায় যাহা সম্ভব) তবে এই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, পৃথিবী কিছুরই অস্তিত্ব থাকিবে না, শুধু থাকিবে সদাজাগ্রত চৈতন্য। এই চৈতন্যময় অবস্থাই জগৎ-সৃষ্টির পূর্বের শূন্যাবস্থা। অর্থাৎ চৈতন্যই ব্রহ্ম। জীব সাধনার দ্বারা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। তবে 'এ সব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন'।

বৈষ্ণব মতে জগৎ মায়া নহে। ব্রহ্মাই লীলার জন্য এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীব ও জগৎ তাঁহারই অংশ। লীলাময় ব্রহ্ম বা কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহারই সৃষ্টি জীব ও জগতের অর্থাৎ রাধার নিত্য লীলা চলিতেছে।

তান্ত্রিকের ব্রহ্মময়ী কালী হইতেছেন শক্তি। তিনিই লীলাময়ী হইয়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার এই লীলারহস্য মানববুদ্ধির অগোচর। সমস্ত সৃষ্টির মূলে এই লীলাময়ী শক্তি রহিয়াছেন। সব কিছুই তাহা হইতে উৎসারিত, 'An infinite and eternal Energy from which proceeds everything.' কাজেই যে উৎস হইতে আমরা আসিয়াছি মনকে যদি সেইখানেই ফিরাইয়া নিতে পারি, সেই সত্যের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতে পারি তবেই সর্বপ্রকার জাগতিক দুঃখ হইতে আমরা মুক্তি পাইব। তান্ত্রিক মতে শক্তিরূপিণী এই সত্য, এই অফুরন্ত রসের উৎস (যাহা হইতে সব কিছুর সৃষ্টি হইয়াছে) আমাদের দেহের মধ্যেই রহিয়াছে।

পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে আকৃষ্ট করে, ফলে আমরা বহির্মুখী হইয়া পড়ি এবং সেই সত্য হইতে দূরে চলিয়া যাই। ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভোগ করে তখন আমরা সুখী হই, যখন ভোগে তাহারা অসমর্থ হয় অথবা ভোগের উপকরণ জোটেনা তখন আমরা ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করি। অবশ্য ভোগেও আমাদের তৃপ্তি হয়না কারণ ভোগ ভোগস্পৃহাকে বাড়াইয়া তোলে। এইভাবে আমরা কামনা বাসনায় পীড়িত হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করি। কিন্তু যদি আমরা ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখী করিয়া সেই সত্যের মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারি তবে আমরা সকল দুঃখের অতীত এক চিরানন্দময় অবস্থার মধ্যে চলিয়া যাইতে পারিব। তখন আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকার দুঃখের অবসান হইবে। 'কূর্ম যেমন করিয়া তাহার সমস্ত অঙ্গগুলিকে বাহির হইতে একেবারে ভিতরের দিকে গুটাইয়া লয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংহার করিয়া বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে একেবারে অন্তর্মুখ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই যথার্থ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। জোর করিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্যাতিত করিয়া নিজেকে নিরাহার রাখিলে কোনও উপকার হয়না—স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বাসনাগুলি যে 'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে',—পরম সত্যের সাক্ষাৎ লাভ হইলেই বাসনা নিবৃত্ত হয়। এসম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন,—

আপূর্যমাণমচল প্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।

জলরাশি যেমন পরিপূর্ণ অতল-গভীর সাগরে প্রবেশ করে সেইরূপ সকল কামনারাশি যাঁহার ভিতরে প্রবেশপূর্বক একেবারে বিলীন হইয়া যায়, শুধু তিনিই শান্তি লাভ করেন, কামকামী ব্যক্তি কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না। নদীর স্রোতের মতন সকল-কামনা-বাসনার ধারা যে নিজের ভিতরে ফিরিয়া আসে তাহা কিসের আকর্ষণে? অন্তরের ভিতরে অফুরন্ত রসের একটি উৎস আগে আবিষ্কার করা চাই; অন্তরের ভিতরে এই রসমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে তাহারই মোহন বেণুরবে 'যমুনা বহত উজান',—বাহির হইতে সকল কামনার স্রোত ভিতরের দিকে উজানে বহিয়া আসে। এমনি করিয়া বাহির হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গুটাইয়া আনিয়া যখন আমরা অন্তরের ভিতরেই সকল সুখ, সকল আরাম, সকল জ্যোতির সন্ধান পাই তখনই আমরা পরম সত্যকে লাভ করিতে পারি।' (ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত)। কামনার স্রোতকে সংহত করিয়া অন্তর্মুখী করিয়া তুলিবার যৌগিক প্রণালীর উল্লেখ তন্ত্রে রহিয়াছে।

তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতিতে মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তিগুলিকে অস্বীকার করা হয় নাই। কামনা-বাসনার দ্বারা পীড়িত মানুষ কি করিয়া ধীরে ধীরে তাহার প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া পরম সত্যে পৌছিতে পারে

তন্ত্রে তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যিনি মুক্তি চাহেন অথবা যিনি ভোগ-পরিপূর্ণ সুখ চাহেন, যিনি পারত্রিক সুখ চাহেন—সকলেই তন্ত্রমার্গ অবলম্বন করিতে পারেন। তন্ত্রের উপাস্যা শক্তি ধন, জন, যশ, প্রতিপত্তি এবং মোক্ষ সব কিছুই দিতে পারেন। কাজেই এই উপাসনায় যোগী, ভোগী, গৃহী, সন্ন্যাসী, ধনী, দরিদ্র সকলেরই সমান অধিকার রহিয়াছে।

বিভিন্ন প্রবৃত্তির ও প্রকৃতির মানুষ ভেদে তন্ত্রসাধনাকে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার এই সাতটি পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। এই সাতটি আচার আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত। যে সকল মানুষ স্থূল জৈব প্রবৃত্তিগুলিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই তাহারা বৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণাচারে যে সাধন পদ্ধতির কথ নির্দিষ্ট আছে সেই অনুসারে অগ্রসর হইবে। ইহারা পশুভাবের অন্তর্গত। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া ইহারা প্রথম নিজেদের শক্তিপূজার উপযোগী করিয়া গঠন করিবে।

জৈবিক প্রবৃত্তিগুলিকে যাঁহারা জয় করিয়াছেন তাঁহারা পঞ্চম-কারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবেন কিন্তু তাহাতে মোটেই বিচলিত হইবেন না। ইঁহারা বীর সাধক। ইহাদের সাধনা বীরভাবের অন্তর্গত। বীরভাবের সাধকরা বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার অবলম্বন করিয়া থাকেন। শব-সাধনা, চিতাসাধনা, চক্রসাধনা প্রভৃতি ভয়াবহ পন্থায় ইঁহারা অগ্রসর হন এবং এইভাবেই ভয়ঙ্করকে জয় করিয়া ইঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন। সন্ন্যাসী বামাক্ষেপা বীরভাবের সাধক ছিলেন।

কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত। ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। কোন প্রকার উপকরণ ব্যতীত ইঁহারা শক্তিপূজা করিয়া থাকেন। কারণ ইঁহাদের পূজা মানসপূজা। কোন তীর্থে গমনের প্রয়োজন ইঁহাদের নাই। ইঁহারা সর্বদা এক দিব্যভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইঁহাদের মন

নির্মল, শান্ত, সর্বপ্রকার সুখ দুঃখের অতীত। এক পরম করুণা দ্বারা ইঁহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। বিশ্বমানবের প্রতি গভীর মৈত্রীভাব ইঁহারা অন্তরে পোষণ করেন। ইঁহাদের দীক্ষা 'মনোদীক্ষা', পূজা 'মানসপূজা', যাগ 'অন্তর্যাগ', যোগ 'কুণ্ডলিনী যোগ' এবং সিদ্ধিও 'দিব্যসিদ্ধি'। রামকৃষ্ণ দেব এই দিব্যভাবের সাধক ছিলেন।

সাধক ক্রমে ক্রমে পশুভাব হইতে দিব্যভাবে উপনীত হইতে পারেন। তখন তিনি সেই অদ্বয় সত্যে বিলীন হইয়া যান এবং সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। 'তিনিই আমি আমিই তিনি—যে কর্মপদ্ধতির সাহায্যে এই ধারণাটি আমাদের মনে দৃঢ় হয়,—আমরা আমাদের দেহগত আত্মাকে চিনিতে, জানিতে, বুঝিতে পারি—আমি কে তাহার ঠিকমত নির্দেশ করিতে পারি, তাহাই সাধনা, তাহাই তপস্যা, তাহাই আরাধনা।'

কায়া সাধন ঃ

তান্ত্রিক সাধনার ফল প্রত্যক্ষ। দেহই এই সাধনার উপকরণ। কায়া-সাধন আরম্ভ করিবার পূর্বে সদ্‌গুরুর নিকট হইতে অবশ্যই দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। যথাযথ প্রণালীতে সাধনা অগ্রসর না হইলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা। এই দেহ পঞ্চভূতে গঠিত কাজেই অশুদ্ধ অর্থাৎ মলমূত্র ক্লেদযুক্ত। প্রাণায়াম ইত্যাদি দ্বারা এই পঞ্চভূতাত্মক দেহকে শুদ্ধ (ভূতশুদ্ধি) করিতে হয়। অতঃপর এই শুদ্ধদেহের বিভিন্ন অঞ্চলে মন্ত্র স্থাপন (ন্যাস) করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই দেহ শক্তিময় হইয়া উঠিবে। এই ন্যাসের বিভিন্ন প্রণালী রহিয়াছে।

সাধক প্রথম ধাতুনির্মিত মূর্তিকে মাতৃমূর্তি জানিয়া বিবিধ উপাচারে পূজা করিবেন। ক্রমে তাঁহার মন এত স্থিরতাপ্রাপ্ত হইবে যে তখন আর মূর্তিপূজার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। তখন তাঁহার পূজা

হইবে অন্তর্যাগ অর্থাৎ মানসপূজা, মানস হোম ও মানস জপ; এই ভাবে দেহ ও মনকে পরিশুদ্ধ করিয়া সাধক কায়া-সাধনের প্রধান অঙ্গ কুণ্ডলিনী যোগ করিবার অধিকার লাভ করিবেন।

এই মানব দেহ শক্তির আধার। চৈতন্যময় সত্তা এই দেহেই অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু এই দেহ সগুণ অর্থাৎ তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই ত্রিবিধ গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। সাধক সাধনপ্রণালী দ্বারা অগ্রসর হইয়া আচ্ছাদনকে উন্মোচন করিয়া পরিণামে চৈতন্যময় সত্তায় অধিষ্ঠিত হন এবং অহর্নিশি চরমানন্দে নিমগ্ন থাকেন। যে শক্তির উৎস হইতে জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই উৎসে তখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া জাগতিক সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া যান।

দেহকে আশ্রয় করিয়াই সাধক সাধনার চরম স্তরে গিয়া উপনীত হন। মনুষ্যজন্ম এবং মনুষ্যদেহকে তান্ত্রিক সাধক উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন নাই। গুণত্রয় দ্বারা মানুষের মন আচ্ছন্ন থাকিলেও জীবের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যদেহেই তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। এইজন্যই এই দেহকেই তাঁহারা সাধনার প্রধান উপকরণ করিয়াছেন।

'তান্ত্রিকগণ এই দেহকে বিশ্লেষণ করিয়া সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীর সন্ধান পাইয়াছেন, তন্মধ্যে সাধন-ব্যাপারে তিনটি নাড়ীই প্রধান; ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। মেরুদণ্ডের বামভাগে চন্দ্ররূপিণী ইড়া, দক্ষিণে সূর্য-স্বরূপিণী পিঙ্গলা ও মধ্যে অগ্নি-স্বরূপিণী সুষুম্না অবস্থিত। এই নাড়ীত্রয়ের মধ্যে সুষুম্নারই প্রাধান্য: ইহা কন্দমূল হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। গুহ্যদেশে এই নাড়ীটীর মুখকে বলা হয় ব্রহ্মদ্বার। দেহস্থ শক্তি—নাদ ও জ্যোতির আকারে এই সুষুম্নাপথেই বিচরণ করিয়া থাকে। নাড়ীগুলি রসবাহী। সাধক এই নাড়ীগুলিকে নদ-নদীরূপে কল্পনা করিয়াছেন: ইড়া—গঙ্গা, পিঙ্গলা—যমুনা, আর সুষুম্না—সরস্বতী; এই তিনটি নাড়ী গুহ্যদেশে ও মস্তকে যে স্থলে মিলিত হইয়াছে, তাহাকে বলা হইয়াছে

'ত্রিবেণী'। দিব্যমন্ত্রী সাধকগণ বাহ্য-স্নানের পরিবর্তে এই দেহ ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া থাকেন।' (অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী)

সুষুম্না নাড়ী গুহ্যদেশ হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। গুহ্যদেশ হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত এই নাড়ীর বিভিন্ন স্থানে ছয়টি চক্র বা পদ্ম আছে বলিয়া কল্পনা করা হয়। গুহ্যদেশ হইতে উর্ধ্বপথে ক্রমান্বয়ে এই গুলির নাম মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। সুষুম্না নাড়ীর মুখকে ব্রহ্মদ্বার বলা হয়। সাড়ে তিন পাক দিয়া (সার্ধ ত্রিবৃত্তাকৃতি) কুণ্ডলিনী শক্তি এই দ্বারের মুখ আচ্ছাদন করিয়া সুপ্তা রহিয়াছেন। এই শক্তিকে জাগ্রতা করিয়া ক্রমে উর্ধ্বমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। শক্তি তখন ক্রমে ক্রমে ছয়টি চক্র অতিক্রম করিয়া সহস্রার পদ্মে অবস্থিত শিবের সঙ্গে মিলিতা হন। 'কুণ্ডলিনী উপর্যুপরি যত উর্ধ্বমুখে যাইতে থাকে, ততই উচ্চতর বৃত্তির বিকাশ, শুদ্ধতর সত্ত্বের প্রকাশ ও নিম্নতর বৃত্তির নিমীলন হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দেহস্থ পদ্মদল বিকশিত হয়, কুণ্ডলিনীর স্পর্শে চক্রস্থ এক এক শক্তি স্বীয় মহিমা বিচ্ছুরিত করিতে থাকেন, সকল শক্তি, সকল ঐশ্বর্য, সকল বিভূতি সাধকের দেহে ভর করে। তখন সাধক স্বয়ং ঐশ্বরিক বিভূতি সম্পন্ন হন।' সাধকের ইহাই চরম আনন্দময় অবস্থা। এই কুণ্ডলিনী-যোগের প্রক্রিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শাক্ত পদাবলীতে সাধনতত্ত্ব :

শাক্ত পদাবলীর সাধনতত্ত্বমূলক পদগুলিতে তান্ত্রিকের কুণ্ডলিনী-যোগের ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং গূঢ়ার্থমূলক ভাষায় এই সাধন প্রণালীর কথা বিবৃত হইয়াছে। শাক্ত পদাবলীতে তান্ত্রিকের দিব্যভাবের সাধনার আদর্শই প্রতিফলিত হইয়াছে। ফলে এই পদগুলির কোথাও শবসাধনা, চিতাসাধনা, পঞ্চ ম-কার, যশ ও অর্থলাভের কামনার কথা দেখা যায়

না। জননীর স্নেহলাভই পদকারদের একমাত্র কামনা ছিল। এই কামনার কথা তাঁহারা নানা রূপকের মধ্যে দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই রূপকগুলি সম-সাময়িক সমাজজীবন হইতে আহৃত।

ভক্তের আকুতি ঃ

মানুষ এই পৃথিবীতে আসিয়া ইহার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ইত্যাদির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিজের সত্যস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যায়। পঞ্চেন্দ্রিয় এবং ষড়রিপুর তাড়নায় সে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এই পৃথিবীর মায়া তাহার মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে যে, তাহার দেহ যে জরা-মরণের অধীন তাহা সে ভুলিয়া যায়। তারপর যখন দেহকে জরা আক্রমণ করে, মৃত্যু তার শাণিত খড়্গ উদ্যত করে তখন মানুষের চৈতন্য হয়। কিন্তু তখন সময় কাটিয়া গিয়াছে। ফলে মানুষ এক নিদারুণ হাহাকারের মধ্য দিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করে। মৃত্যুর পূর্বে এক দুঃসহ নরকযন্ত্রণা তাহার নিত্যসঙ্গী হয়।

কিন্তু কেন এই শাস্তি? জগজ্জননী কেন তাঁহার সন্তানদিগকে এই কঠোর শাস্তি প্রদান করেন? জননীর স্নেহলাভেচ্ছু ভক্ত সন্তানের মনে তাই তীব্র অভিমান জাগিয়াছে—

আমি তাই অভিমান করি,
আমায় করেছ গো সংসারী॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ও মা তুমিও কোন্দল কোরেছ বলিয়ে শিব ভিখারী। (রামপ্রসাদ)

তবে মা কেন সন্তানকে অর্থহীন করিয়া এই পৃথিবীতে পাঠাইলেন? কিন্তু বিষয় সম্পত্তি দিলেই কি সন্তান সুখী হইত? তাহাও তো মনে হয় না—

এখনো কি ব্রহ্মময়ি, হয়নি মা তোর মনের মত ?
অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত ॥
দম দিয়ে ভবে আনিলি, বিষয়-বিষ খাওয়াইলি,
সংসার বিষে জ্বলি যত ; দুর্গা দুর্গা বলি তত,
বিষ হর মা বিষহরি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হত। (রামকৃষ্ণ রায়)

আসল কথা, 'কিছুই চাই না মা, যদি তোর অভয় পদ পাই।' মা সেই আশা দিয়াই এই পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন। এখন কেন সেই আশা তিনি পূর্ণ করিতেছেন না?—

কেবল আসার আসা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো ॥
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ও মা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেল ॥
মা, খেলবি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল ॥

কাজেই—

রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ॥
(রামপ্রসাদ)

সন্তানের প্রতি যদি জননীর এতই স্নেহ তবে তাহার উপর অবিচার হইতেছে কেন ? কেন তাহাকে ষড়রিপুর অধীন করা হইল ?

মা গো তারা ও শঙ্করি,
কোন্ অবিচারে আমার পরে, করলে দুঃখের ডিক্রী জারি ?
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল্ মা কিসে সাফাই করি ?
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছয়টারে ; বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ॥
(রামপ্রসাদ)

এই ভব-সংসারের গারদে জীব যেন দীর্ঘ-মেয়াদের কয়েদী। ষড়রিপুর ছয়টা দূত সর্বদাই তাহাকে পীড়ন করে। অসহায় জীব এই দুঃখের দহনে দগ্ধ। তাই সে আর্তনাদ করিয়া বলে—

তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার-গারদে থাকি বল ?
মসিল ছয় দূত, তসিল করে কত, দারা-সুত পায়ের শৃঙ্খল ॥
দিয়ে মায়া বেড়ি পদে, ফেলেছ বিপদে, সম্পদে হারালেম মোক্ষফল
এবার হলনা সাধনা, ও মা শবাসনা, সংসার-বাসনা বড়ই প্রবল ॥
(নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়)

সাধন-সম্পদহীন নিঃসম্বল জীব খালি ভূতের বেগার খাটিয়া মরে। এই অবস্থায় যৎসামান্য যাহা কিছু উপার্জিত হয় এই পঞ্চভূতে কাড়িয়া নেয়। সে বাধা দিতে পারে না। বাধা দিতে গেলে পঞ্চভূত, ষড়রিপু, দশ-ইন্দ্রিয় ইহারা রুখিয়া দাঁড়ায়। সে ইহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। একমাত্র মৃত্যু ছাড়া তাহার উদ্ধার নাই—

মলেম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন-মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে ॥
পঞ্চভূত, ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে,
তারা কারো কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল খেটে ॥
(রামপ্রসাদ)

কিন্তু কেন এই শাস্তি ? কোন্ অপরাধে—

কি অপরাধ করেছি মা,
কেন এত শাস্তি কড়া ? (প্যারীমোহন)

কতকাল এই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে—

মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত ?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত॥

(রামপ্রসাদ)

এই কি জননীর ব্যবহার? এমনভাবে তিনি সন্তানকে অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়াছেন যে সন্তান মাকে পর্যন্ত ডাকিবার সময় পায় না—

চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি ?
নামে জগৎ-চিন্তাময়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি !
প্রভাতে দাও বিষয়-চিন্তে, মধ্যাহ্নে দাও জঠর-চিন্তে,
ও মা শয়নে দাও সর্ব-চিন্তে,
বল্ মা তোরে কখন ডাকি। (শম্ভুচন্দ্র রায়)

আর ডাকিলেই বা কি? বিশ্ব-সংসারের রীতিই এই যে, সন্তান ডাকিলেই মা সাড়া দেন। ছুটিয়া গিয়া সন্তানকে কোলে তুলিয়া নেন। কিন্তু এ কেমন মা—

মা বলে কাঁদলে ছেলে, জননীর কি প্রাণে সয় !
ধেয়ে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে কত কয়।
এই তো মায়ের ধারা, মায়ের বাড়া তুমি তারা,
কেঁদে ডাকি পাইনে সাড়া, ভয়েতে কাঁপে হৃদয়।

(বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়)

অতঃপর অভিমান ক্ষোভে পরিণত হয়। মাকে তিরস্কার করিয়া ভক্ত গায়ের জ্বালা মিটাইতে চায়—

যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে !
দয়াহীন না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে ?

দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই তোমাতে ;
গলে পর মুণ্ডমালা পরের ছেলের মাথা কেটে। (নরচন্দ্র রায়)

এত তিরস্কারেও মায়ের সাড়া পাওয়া যায় না। তখন মনে সন্দেহ জাগে সর্বনাশী বোধ হয় মরিয়া গিয়াছে। তাঁহাকে আর ডাকিয়া লাভ কি?—

মা বলে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই !
থাকলে আসি দিতো দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হলেম ওষ্ঠাগত, কেন আর যন্ত্রণা পাই। (নরচন্দ্র রায়)

তখন মনে ধিক্কার জাগে। পরক্ষণেই মনে হয় মাকে দোষ দিয়াই বা কি লাভ ? নিজের দোষও তো কম নয়—

দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবি মরি শ্যামা। (দাশরথি রায়)

আবার সেই মায়ের দিকেই মন ছুটিয়া যায়। কোথায় তবে আশ্রয় !

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা ?
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা। (রামপ্রসাদ)

মা, তুমিই একমাত্র আশ্রয়। সমস্ত কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়াছি। হৃদয়কে শ্মশান করিয়াছি। তুমিও তো মা শ্মশানই ভালবাস?—

শ্মশান ভালবাসিস্ বলে, শ্মশান করেছি হৃদি ;
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি ॥
আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে,
ও মা, চিতা-ভস্ম চারি ভিতে,
রেখেছি মা আসিস যদি। (রামলাল দাস দত্ত)

ভক্তের আকুলতা আরও তীব্রতর হয়। কারণ সে জানে মা ছাড়া যে আর কোন গতি নাই। তাই করুণ মিনতিতে সে ভাঙিয়া পড়ে—

সারাদিন করেছি মা গো, সঙ্গী লয়ে ধূলা খেলা
ধূলা ঝেড়ে নে মা কোলে, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা।
কত ছাই-মাটি দেখ্ গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পুঁছে দে মা গায়ের মলা।

(চন্দ্রনাথ দাস)

'ভক্তের আকুতি' শীর্ষক পদগুলিতে জগজ্জননীর প্রতি ভক্তের মান-অভিমান, অনুযোগ-তিরস্কার যতই প্রকাশিত হোক না কেন জননীর স্নেহই যে একমাত্র কাম্যবস্তু, জননীর চরণই যে একমাত্র আশ্রয়স্থল এই সত্য দীপ্যমান। তাই এই আকুতি শরণাগতের আকুতি। মায়া-মোহে আবদ্ধ ভক্ত জানে যে, জননীকে আশ্রয় করিতে পারিলেই ভবের দুঃখের, জ্বালার নিরসন হইবে। মায়াবদ্ধ ভক্তের পূর্ণজ্ঞান সর্বদা জাগ্রত। সে জানে জননীই মোক্ষদাত্রী। তাই নানাভাবে জননীর কাছে আকুতি জানান হইয়াছে। কিন্তু এই মুক্তি কামনার মধ্যে সংসারকে উপেক্ষা করিবার কথা নাই। এই ভব-রঙ্গমঞ্চে থাকিয়া, ইহার সর্ববিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জড়িত থাকিয়াও মন যেন সর্বদা মাতার চরণে নিবদ্ধ থাকে ইহাই ভক্তের প্রার্থনা। জননীর নিকট ইহাই তাহার আকুতি।

মনোদীক্ষা—তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতিতে দীক্ষার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সাধন-পদ্ধতির প্রক্রিয়া অত্যন্ত দুরূহ। ঠিক পথে অগ্রসর না হইলে পদে পদে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তাই গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। দীক্ষা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কেহই শক্তিপূজার অধিকারী হইতে পারে না। দীক্ষা যিনি দিবেন তাঁহাকে কৌলাচারী সিদ্ধ সাধক হইতে হইবে।

তান্ত্রিকের দীক্ষার দুইটি দিক আছে—বাহ্য ও আন্তর। সাধন-প্রণালীর ক্রিয়াকলাপ অবগত হওয়া বাহ্য দীক্ষার অন্তর্গত। এই ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ধীরে ধীরে সাধকের মনে ভক্তির সঞ্চার হয় এবং কামনা-বাসনা জড়িত এই দেহ পরিণামে শক্তিপূজার অধিকারী হইয়া উঠে।

কিন্তু আসল দীক্ষা আন্তর দীক্ষা অর্থাৎ মনোদীক্ষা। মানুষের মন অত্যন্ত চঞ্চল। যদিও মন ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক তথাপি দেখা যায় ইন্দ্রিয়গণই মনকে চালাইয়া থাকে। মন যদি স্থির ও সংযত হয় তবে ইন্দ্রিয়াদিও অচঞ্চল হইতে বাধ্য হইবে। কাজেই প্রথমতঃ মনকে সংযত করিতে হইবে। কারণ মনের দ্বারাই মানুষ বদ্ধ হয় এবং মনই মানুষকে মোক্ষের পথ দেখায়। মনকে সংযত না করিয়া শুধু যোগীর বেশ ধরিলেই কাজ হইবে না—'মন না রাঙ্গায়ে কি ভুল করিয়ে বসন রাঙ্গালে, যোগী'। কাজেই মনোদীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। 'মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মনকে যে রঙ্গে ছোপাবে সেই রঙ্গেই ছুপবে। যেন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙ্গে ছোপাও সবুজ'। (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ) কিন্তু মন সহজে বশে আসিতে চায় না। মাতৃভক্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ বিবেকের সঙ্গে মনের অহরহঃ লড়াই। ভক্ত তাই মনকে নানাভাবে প্রবোধ দেন, তাহাকে বোঝান—

(ক) মন কি ভুলে ভুলিয়াছ, ভুলে কি ভুলিতে নার!
ভুলে মূল হারাবে পাছে, মূলেরি সন্ধান কর॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, পরিজন আছে যত
যাকে অতি ভালবাস, সে-রূপ ভাব মায়ের॥

(রামদুলাল নন্দী)

(খ) মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা॥ (রামপ্রসাদ)

কিন্তু মন বুঝিতে চায় না। সে শুধু বাহ্যিক আচার আচরণ দ্বারাই কাজ সারিতে চায়। মনে যদি মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত না হইল তবে বাহ্যিক পূজায় কি ফল—

মন, তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন, তাই চেয়ে দেখলে না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কি তাই জান না?
মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তাঁর উপাসনা॥

(রামপ্রসাদ)

তবে কি করিতে হইবে? খুব শক্ত কিছু করিতে হইবে না। ভক্ত মনকে বলেন—

মন, তোর এত ভাবনা কেনে!
একবার কালী বলে বস্‌রে ধ্যানে॥
জাঁক-জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু-পাষাণ মাটির মূর্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে?
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে॥

(রামপ্রসাদ)

অতঃপর ভক্ত 'বাপু', 'বাছা' বলিয়া মনকে একটু স্থির হইতে অনুরোধ করেন এবং মনকে লোভ দেখান—

মন, থাক তুমি চুপটি করে!
তোমায় তারা-পাখী দিচ্ছি ধরে॥

'মনোদীক্ষা'-র পদগুলিতে সাধনতত্ত্বের কথাই নানাভাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই পদগুলিকে কবিত্ব-বর্জিত বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। দৈনন্দিন জীবনের সুপরিচিত ঘটনার রূপকের—কৃষিকাজ, কাপড়-ধোলাই, ফাঁদ পাতিয়া পাখী ধরা, ঘুড়ির গোত্তা খাওয়া, বাদাম তুলিয়া নৌকা চালানো—সাহায্যে এই তত্ত্ব এমন-ভাবে পরিবেশিত হইয়াছে যাহাতে ইহাদের কাব্য-সৌন্দর্য মনকে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। আর মন ও বিবেকের লড়াইটিও খুব মনোহারিত্বের সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।

মাতৃপূজা ও সাধন-শক্তি—মনোদীক্ষায় দীক্ষিত সাধক মাতৃ-পূজার অধিকারী হইলেন। এই পূজায় মৃণ্ময় মূর্তি, জাঁকজমক কিছুরই প্রয়োজন নাই। সাধক তাঁহার হৃদয়ে মায়ের মানস মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক এই দেহ হইতেই পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মায়ের পূজা করিবেন—

> শ্যামাপূজা, কালীপূজা, শক্তিপূজা কথার কথা নয়।
> যদি কথার কথা হতো, চিরদিন ভারত শক্তি পূজে,
> শক্তিহীন হতো না।
> কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায়, শক্তিপূজা হয় না।
> এক মনোবিল্বদল, ভক্তি-গঙ্গাজল, শতদল দিলে হয় সাধনা।
> (হরিনাথ মজুমদার)

দেবীর মূর্তি, মন্ত্রতন্ত্র, বাহ্যিক উপচার ইত্যাদির মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে সাধক মানসপূজার অধিকারী হইয়া উঠেন। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি সর্ব উপায়ের সমন্বয় সাধন করিয়া তন্ত্র পরমার্থকে লাভ করিবার পন্থার নির্দেশ দিয়াছে। স্থূল উপাসনা হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মের পথে লইয়া গিয়াছে।

মাতৃপূজায় সিদ্ধ হইলে সাধক অপরিসীম শক্তির অধিকারী হন। সাধন-শক্তিতে বলীয়ান সাধক তখন মোক্ষপথের শেষ প্রান্তে গিয়া

উপনীত হন। যে অদ্বয়-সত্য হইতে জীবের সৃষ্টি হইয়াছে তিনি সেই অদ্বয়-সত্যে বিলীন হইয়া যান। জননী আর ভক্তে তখন কোন পার্থক্য থাকে না—

আর ভুলালে ভুলবো না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলবো দুলবো না গো॥
(রামপ্রসাদ)

সাধক তখন ব্রহ্মময়ী কালীতে বিলীন হইয়া যান। তাইতো তিনি অনায়াসে বলিতে পারেন—

এবার কালী তোমায় খাব,
খাব খাব গো দীন দয়াময়ি।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা করে যাব॥
ডাকিনী যোগিনী দিয়ে, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্ভার চড়াব॥
হাতে কালী, মুখে কালী, সর্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কষে, সেই কালী তার মুখে দিব॥
(রামপ্রসাদ)

কিন্তু সাধক একেবারে নির্বাণ চাহেন না। কারণ তাহা হইলে মানস-পূজায় যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন। বৈষ্ণবদের মতই শাক্তরা নরজন্মকে হেলা করেন না। সেই অদ্বয়-সত্যের নিত্য উপলব্ধির আনন্দময় অনুভূতি এই নরজন্ম লাভের ফলেই তো সম্ভব হইয়াছে। তাই সাধক বলেন—

খাব খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদি-পদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব॥ (রামপ্রসাদ)

নাম-মহিমা ও চরণতীর্থ—মায়ের নামোচ্চারণ করিলেই সর্ব ভয় বিদূরিত হইবে। যাগ-যজ্ঞ, তীর্থ ভ্রমণ কোন কিছুর প্রয়োজন নাই—

(ক) গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়। (মদন মাস্টার)

(খ) দুর্গা-নামে রয় না জীবের ভয়-ভাবনা।
ভয়-ভাবনা যম-যাতনা রয় না, ও নাম্ নাও রসনা।
(কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন)

এই নাম-মহিমার মধ্যেও তত্ত্বের ইঙ্গিত রহিয়াছে—

কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন, ষট্‌চক্র-রথ-মধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়, রথ চালায় দেশ দেশান্তরে॥
তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করোনা রে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে॥
(রামপ্রসাদ)

মায়ের চরণই জীবের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। অনর্থক দেশ-দেশান্তরে তীর্থ ভ্রমণে গিয়া কি ফল—

তীর্থবাসী হওয়া মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে।
শ্যামার চরণ বিনে রে মন, কোন তীর্থ কোথায় আছে?
(শম্ভুচন্দ্র রায়)

মায়ের চরণেই রাশি রাশি তীর্থ রহিয়াছে। মনোদীক্ষায় দীক্ষিত, মানস-পূজায় সিদ্ধ সাধকের হৃদয়ে সেই সকল তীর্থরাশি অহর্নিশি প্রকটিত—

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া-গঙ্গা-বারাণসী।
হৃৎ-কমলে ধ্যান-কালে আনন্দ-সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥ (রামপ্রসাদ)

শাক্ত পদাবলীর নানাদিক

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা দেশ, বাঙালী সমাজ ও শাক্ত পদাবলী—শাক্ত পদাবলীর কবিগণ সাংসারিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। এই সকল কবিদের মধ্যে অনেকেই রাজা, জমিদার, দেওয়ান, সম্পন্ন ভূস্বামী ইত্যাদি ছিলেন। যুগের আবহাওয়া তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। ফলে তাঁহাদের রচিত কাব্যে অত্যন্ত বাস্তবতার মধ্য দিয়া যুগের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। কাজেই শাক্ত পদাবলী যে যুগে রচিত হইয়াছিল সেই যুগের কিঞ্চিৎ পরিচয় জ্ঞাত হওয়া এই পদাবলী আস্বাদনের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই শাক্ত পদাবলীর জয়যাত্রা শুরু হয়। এই শতাব্দী পদাবলীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনকে গুরুতররূপে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই যে, দিল্লীর রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া বাঙলাদেশেও পৌছিল। একদিকে বাঙলাদেশে দিল্লীর শাসন কর্তৃপক্ষের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ অপরদিকে বাঙলার নবাবী মসনদ লইয়া বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র ও আত্মকলহ। ইংরাজ বণিকশক্তি এই চক্রান্তে নাক গলাইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তৎপর। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ দেখিবার কেহ নাই। সমগ্র দেশ অরাজকতায় আচ্ছন্ন। এমন সময় আবার মারাঠাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়িল বাঙলাদেশের উপর। তাহাদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী বাঙালী কোনদিনই ভুলিতে পারিবে না। সেই কুখ্যাত বর্গীর হাঙ্গামার বিবরণ আমাদের ছড়াগুলিতে পর্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছিল। এই হাঙ্গামার ফলে পশ্চিমবঙ্গের

কৃষি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। শুধু কৃষি নয়, পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রবের ফলে বাঙ্গলার বাণিজ্যের অবস্থাও সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। নবাবের তো বটেই, প্রজার উপর সাধারণ জমিদারের অত্যাচারও সকল প্রকার সহনশীলতার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। পাইকারী ও খুচরা দ্রব্যের উপর নবাব, জমিদার, ভূস্বামীবর্গ এত অধিক করভার চাপাইয়া দিয়াছিলেন যে, দৈনন্দিন অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের—চাল, ডাল, নুন, তেল ইত্যাদির মূল্য অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছিল। ফলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্গতির অবধি ছিল না। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে দ্রব্যের দুর্মূল্যতা সম্পর্কে একটি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। সুন্দর মালিনী মাসীকে জিনিস কিনিতে বাজারে পাঠাইয়াছিল। বাজার হইতে ফিরিয়া মালিনী হিসাব দিতেছে—

আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্য আমি চিনি॥
আট পণে আনিয়াছি কাঠ আট আটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি॥
খুন হয়েছি বাছা চুণ চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥
মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝিবে বাড়িবে দাম উত্তর উত্তর॥
শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

সাধারণ মানুষের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে বাঙ্গলাদেশের সর্বত্র অবাধে মানুষ বিক্রয় হইত। বিদেশের বণিকরা আসিয়া সমর্থ পুরুষ, সুন্দর শিশু ও সুন্দরী নারীদিগকে ক্রয় করিয়া দেশ-দেশান্তরে চালান দিত।

কুশাসন, দস্যুর উপদ্রব এবং তাহার ফলে নিদারুণ আর্থিক সঙ্কট ইহাই ছিল তৎকালীন বাঙ্গলাদেশের দৈনন্দিন চিত্র। প্রজার উপর নবাব, জমিদার, ইত্যাদির নির্মম শোষণ, মহাজন, বণিক প্রভৃতির উপর দস্যুর হামলা, অবাধে লুণ্ঠন, নরহত্যা ইহাই ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। অসহায় নরনারীকে কে রক্ষা করিবে? দেশে আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। অন্যায়ভাবে প্রজাকে ধরিয়া মারপিট, বিনা কারণে ডিক্রিজারী, নীলাম, পেয়াদার অত্যাচার, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অত্যাচার, সর্বোপরি নবাবের অত্যাচার—কোথায় আশ্রয় মিলিবে? অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই দেশের চিত্ত তখন জগজ্জননীর চরণে আশ্রয় খুঁজিল। জগজ্জননী মাতার নিকট করুণ আবেদন জানাইয়া ভক্ত সন্তান নিজেকে রক্ষা করিবার পথ খুঁজিয়া বাহির করিল।

শাক্ত-পদাবলীর কবিরা অধিকাংশই সংসারী ছিলেন বলিয়া ঐ যুগের সামাজিক চিত্র স্বভাবতই তাঁহাদের কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। ঐ যুগের বৃহত্তর জনসমাজের মূক বেদনাই যেন তাঁহাদের কবিতার ভাষা পাইয়াছে। হতাশায় পরিপূর্ণ, নিরানন্দ জীবনের নৈরাশ্য ও চিত্তদীর্ণ হাহাকার শাক্ত কবিগণের গানের উপর বিস্তৃত হইয়াছে। দেখিতে পাই 'শাক্ত পদাবলীতে সংসার উহার সমস্ত ক্রুরতা, বঞ্চনশীলতা ও অত্যাচার-উৎপীড়নের দারুণ বোঝা লইয়া অতি স্থূলরূপে প্রকট। পদের ফাঁকে ফাঁকে, উল্লেখ-ইঙ্গিতে তুলনায়-রূপকল্পে সমাজ জীবনের বাস্তব সমস্যা ছায়াপাত করিয়াছে। এখানে আমরা ডিক্রি-ডিসমিস, তহবিল-তছরূপ, হিসাবের খাতা প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের অনুষঙ্গের কথা শুনি; ঘুড়ি-ওড়া, পাশা খেলা প্রভৃতি আমোদ-প্রকরণকে রূপকরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখি; বহু-বিবাহ-বিড়ম্বিত পরিবারে বিমাতার স্নেহহীন, বিমাতৃশাসিত পিতার ঔদাসীন্যের খবর পাই।' অত্যচারের সম্মুখীন হইবার সাহস এবং অত্যাচার হইতে রক্ষা

পাইবার কামনা—এই দুই প্রকার মনোভাবের সংমিশ্রণ শাক্ত পদাবলীর মধ্যে পরিস্ফুট হইল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, মধ্যযুগে মঙ্গল-কাব্যের দেবদেবীরাও এই ভীতি ও স্বার্থবুদ্ধি হইতে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সকল দেবীরা ছিলেন ভীষণা উগ্রা। তাঁহারা জোর করিয়া ভক্তের নিকট হইতে পূজা আদায় করিতেন। কিন্তু শাক্তগীতিতে বন্দিতা দেবীর কাছে ভক্ত স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিল এবং আত্মরক্ষার জন্য কাতর নিবেদন জানাইল। কেন এমন হইল? মঙ্গলকাব্যের নিষ্ঠুরা দেবী-সঙ্ঘ ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, মুসলমান রাজশক্তির অত্যাচারের পটভূমিকায় এবং অনার্য ও বৌদ্ধ-তান্ত্রিক প্রভাব হইতে জাত নিষ্ঠুর প্রকৃতির দেবীকুল পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে ক্রমশঃ মঙ্গলদায়িনী দেবীরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেলেন। তখন এই সকল দেবীদের ভক্তের নিকট হইতে জোর করিয়া পূজা আদায়ের কোন প্রয়োজন রহিল না, ভক্তই স্বপ্রয়োজনে সন্তানবৎসলা দেবীর শরণাপন্ন হইল। কাজেই ঐ যুগে বাঙ্গালীর সংসার ও ভাবজীবনে যে গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা একদিকে যেমন সাধনার ক্ষেত্রে তেমনি অন্যদিকে কাব্যের ক্ষেত্রে নূতন রীতিতে আত্মপ্রকাশ করিল।

সাধনার সত্য ও কাব্যরসের উপাদান

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম-মৃত্যুর, সৃষ্টি-প্রলয়ের রহস্য ভেদ করিতে না পাইয়া মানুষ সমস্ত কিছুর পশ্চাতে সর্বশক্তিমান এক সত্তা রহিয়াছেন বলিয়া কল্পনা করে। এই সত্তার স্বরূপ কি, তাঁহাকে কিভাবে অন্তরে উপলব্ধি করা যায়, কিভাবে তিনি জীবের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ হইয়া

রহিয়াছেন; জীবের জন্মই বা কি কারণে হয়, মৃত্যুর পরেই বা জীব কোথায় যায় ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের মনে জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। ভারতীয় দর্শনে এইসব প্রশ্ন সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা রহিয়াছে।

এই সত্যকে লাভ করিবার যে সক্রিয় পন্থা, যে সকল আচার, আচরণ ও বিধির পরিকল্পনা তাহাই ধর্ম বা সাধন-পদ্ধতি। সাধন-পদ্ধতির বা ঈশ্বরোপাসনার এত বিচিত্র প্রণালী ভারতবর্ষের মত পৃথিবীর আর কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় না।

যে সর্বব্যাপী সত্তার কথা বলা হইল তাঁহাকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া কল্পনা করা হয়। ইহাকে লাভ করিবার উপায়ই বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে। সর্বশক্তিমান ভগবানের 'শক্তি' কল্পনা ভারতীয় দর্শনের একটি বিশেষ অবদান। ভগবান যাহা কিছু করিতেছেন তাহার মূলে রহিয়াছে তাঁহারই এক সর্বব্যাপিনী শক্তি। এই শক্তিই সর্বক্রিয়া এবং সর্বজ্ঞানের মূল কারণ, এই শক্তিই দেবীরূপে বন্দিতা। মূলতঃ শক্তিমান অর্থাৎ ভগবান ও তাঁহার শক্তি অভেদ। এই অভেদত্ব ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত হইলেও শক্তিকে শক্তিমান হইতে পৃথক করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্তন ভারতীয় শক্তিবাদের মূলতত্ত্ব। এই শক্তিবাদই ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করিবার প্রেরণা দিয়াছে।

শক্তিপূজার প্রধান ধারক হইলেন শাক্ত বা শৈবগণ। শিব ও শক্তির মিলিত রূপই মানবের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে। শিব হইতেছেন সেই আদি সত্য অর্থাৎ ভগবান। শক্তি হইতেছেন শিবের শক্তি। শিব-যুক্তা শক্তিই বিশ্বসৃষ্টির মূলে রহিয়াছেন। কাজেই উভয়ের সম্মিলিতরূপই হইলেন পরমার্থ এবং জীব একমাত্র তাঁহাকেই কামনা করিয়া থাকে।

তান্ত্রিকরা শক্তির উপাসক। তবে তাঁহাদের এই শক্তি মানুষের দেহাভ্যন্তরেই অবস্থান করিতেছেন। পঞ্চভূতে গঠিত মানুষের এই দেহ

মৃত বা শব ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত এই দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত শক্তিকে জাগ্রতা করা না যাইতেছে ততক্ষণ এই স্থূল দেহ মৃতদেহেরই সমতুল্য। দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিতা শক্তিই হইতেছেন প্রাণ বা চৈতন্য। এই চৈতন্য বা কুণ্ডলাকারে সুপ্তা শক্তিকে জাগ্রতা করিয়া ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগামী (মূলাধার হইতে সহস্রারে) করিতে হইবে। এই শক্তি জাগ্রতা হইলেই আমাদের ভৌতিক দেহ শব বা শিবে পরিণত হইবে এবং শিব ও শক্তির পূর্ণ মিলন ঘটিবে। তখন সাধক অপার আনন্দে নিমজ্জিত হইবেন। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি সকল প্রকার ভবযন্ত্রণা হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন। ইহাই হইল তন্ত্র-সাধনার সত্য। এই সাধনার সত্যই শাক্তপদকারগণের হাতে কাব্যের সত্যে পরিণত হইয়াছে।

অন্তরের উপলব্ধ সত্যই কাব্যে রূপ লাভ করে। ধর্ম নিঃসন্দেহে উপলব্ধির বিষয়। এই উপলব্ধিকে শাক্তপদকারগণ জীবনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যে সমর্পণ করিয়াছেন। শাক্তপদকারগণের সাধনা রিক্ত বৈরাগ্যের সাধনা নয়। কাজেই সাংসারিক ও সামাজিক সুখ-দুঃখ সম্পর্কে তাঁহারা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এইজন্য তাঁহাদের রচিত পদসমূহে সাধনার সত্যের সঙ্গে সমাজ ও পরিবার জীবনও অতি সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। উহাতে যে সব রূপক ব্যবহার করা হইয়াছে সেইগুলিতে তৎকালীন সমাজজীবনের প্রতিফলন স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়। আর বৈষ্ণব পদকর্তাগণের যেমন বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকে উপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না শাক্তপদকর্তাগণের ক্ষেত্রে সেইরূপ কোন বিধিনিষেধ ছিল না। যদিও উপাস্যতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্ব শাক্ত কবিদের মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তবুও তাঁহাদের স্বাধীনতা ইহাদের দ্বারা সর্বাংশে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আত্মগত হইয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশে তাঁহাদের কোন বাধা ছিল না এবং শাক্তপদাবলীতে স্বতঃস্ফূর্ত

হৃদয়ের আবেগ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। কাজেই কাব্য হিসাবে শাক্ত পদাবলীর প্রতিষ্ঠা অনস্বীকার্য।

পুরাণ ও তন্ত্রের শক্তিদেবী ও শাক্ত পদাবলীর শক্তিদেবী

শাক্তপদাবলীতে যে দেবীর বন্দনা করা হইয়াছে তিনি তান্ত্রিক দেবী। তান্ত্রিকদের কাছে এই দেবীই পরমাত্মা শক্তির বিশ্বব্যাপিনী বিরাট রূপ। অর্থাৎ ইনিই জগজ্জননী। মাতৃভাবে সর্বশক্তিমান পরমাত্মাকে যাঁহারা সাধনা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই দেবীই সেই মাতা। মাতৃভাবে ভগবানকে আরাধনা করিবার রীতিটি ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। এই সাধনাকে ভিত্তি করিয়া এক বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন দর্শন ও পুরাণ গ্রন্থ, বিরাট তন্ত্রশাস্ত্র, ধর্মমূলক স্তোত্র ও কবিতা, প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রকীর্ণ শ্লোকসমূহ, বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের সাধনসঙ্গীত, চর্যাপদ এবং মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে মাতৃকাশক্তিকে নানাভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিরাট সাহিত্য দ্বারা বিশেষ করিয়া তান্ত্রিক সাহিত্য দ্বারা শাক্তপদাবলী গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করিব যে, 'পুরাণ ও তন্ত্রে বর্ণিত শক্তিদেবী বাঙ্গালী ভক্ত কবিগণের হৃদয়ে আসিয়া একটি নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন।'

প্রথমে পুরাণের কথাই ধরা যাক। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ এবং হিমরাজগৃহে তাঁহার জন্ম—এই কাহিনীটি দেবীভাগবত, কালিকা-পুরাণ, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ইত্যাদি পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। শাক্ত পদাবলীর আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতগুলিতে এই কাহিনীই গ্রহণ করা

হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্যের কথাই এই সঙ্গীত-গুলির মূল সুর। পৌরাণিক পটভূমিকায় রচিত হইলেও আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনেরই সঙ্গীত। বাঙ্গালীর ঘরের কথাই এই সকল পদে কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে শেফালিকাগন্ধবিধুর শারদপ্রভাতে আবেগ-ভরা করুণ রাগিণীতে এই গানগুলি যখন গায়ক গৃহে গৃহে ঘুরিয়া গাহিতে থাকে তখন বাঙ্গালীর হৃদয় এক অপার্থিব আনন্দ-বেদনায় সিক্ত হইয়া উঠে।

এইবার তন্ত্রে বর্ণিত শক্তিদেবীর কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে করালবদনা, ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা দেবীর যে বর্ণনা আছে শাক্তপদাবলীতে তাহার সুস্পষ্ট ছায়াপাত হইয়াছে। শক্তিদেবী এবং তাঁহার—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

দশমহাবিদ্যারূপই শাক্তপদাবলীতে প্রতিফলিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাবই শাক্তপদাবলীতে সর্বাধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।—জগজ্জননীর রূপকল্পনায় শাক্তপদকর্তাগণ বলিতে গেলে তন্ত্রে উল্লিখিত দেবীর ধ্যানমন্ত্রগুলি অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রে দেবীকে করাল-বদনা, চতুর্ভুজা, ভীষণাকৃতি, আলুলায়িতকেশা, মুণ্ডমালাশোভিতা, দিগম্বরী রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শাক্ত পদাবলীতেও দেবীকে—

কে ও একাকিনী, কাহার রমণী, শশি-শোভা জিনি মসীবরণী।
দশনে রসনা ধরা, বদনে রুধির-ধারা, করালবদনী।
এ নব বয়সী, ঘোররূপা মুক্তকেশী, শোভে দীর্ঘ বেণী।
গলে দোলে মুক্তাহার, কটি-তটে নর-কর-রচিত কিঙ্কিণী॥

রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও লক্ষণীয় এই যে, দেবীর ঘোরা মূর্তির অন্তরালে সাধক তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহাকে সর্বমঙ্গলা করুণাময়ী জননীরূপে বন্দনা করিয়াছেন—

কে বলে আ মরি! তোমায় দিগম্বরী,
শবাসনা বিবসনা ভয়ঙ্করী!
জ্ঞান-নেত্রে আমি চেয়ে দেখি, তুমি
সর্বময়ী সর্বমঙ্গলা সুন্দরী।

এবং পরিণামে এই দেবী যেন একেবারে ঘরের মা হইয়া গিয়াছেন। সব তত্ত্ব যেন দূরে চলিয়া গিয়াছে। মনে হইয়াছে দেবীকে মা বলিয়া ডাকিতে কত সুখ—

ও মা কালী মুণ্ডমালী; আমায় কি ভাব দেখাইলি।
'মা' বলতে মা শিখাইয়ে, 'মা' বলতে মা মাতিয়ে দিলি।

এই তন্ত্রের ভীষণা দেবী বাঙ্গালী ভক্ত কবিগণের হৃদয়ে আসিয়া এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্য ও শিবায়নের হর-গৌরী এবং আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত

ভারতীয় সাহিত্যকে শিবের মত আর কোন দেবতাই এতো প্রভাবান্বিত করিতে পারেন নাই। শিব আমাদের সাহিত্যে নানাভাবে পরিকল্পিত হইয়াছেন। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কয়েক সহস্র বৎসরের ভারতীয় সাহিত্যে শিব একক ও অসঙ্গ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এই শিব বৈদিক যুগে রুদ্র, পৌরাণিক যুগে শান্ত ও সমাহিত এবং পররর্তী যুগে গৃহী এমন-কি

কৃষক রূপে চিত্রিত হইয়াছেন। 'একদিকে এই দেবতা যেমন ঘোর, ভৈরব এবং রুদ্র আবার তেমনই অন্যদিকে অঘোর, শিব এবং দক্ষিণ— আবার তিনিই যোগীশ্বর ও যোগীন্দ্র। পৌরাণিক সাহিত্যের ভিতর দিয়াই প্রধানতঃ আর্যধর্ম বাংলাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া এই দেবতার চরিত্রগত বিভিন্নমুখী এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম হইতেই এই দেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য কোথাও তিনি মঙ্গলকারী দেবতা, আবার কোথাও তিনি রুদ্র ভয়ানক।' (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস— ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য)। এই শিব মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্য-গুলিতে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ এবং পরে গিরিরাজ হিমালয়ের ঘরে মেনকার গর্ভে তাঁহার জন্ম এই পৌরাণিক কাহিনীটি মধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে (চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শিবায়ন ইত্যাদি) বর্ণিত হইয়াছে। গিরিরাজ ও মেনকার কন্যা গৌরী বা পার্বতীর বিবাহ হয় মহাদেবের সঙ্গে। তাঁহাদের ঘর-গৃহস্থালীর কথা মঙ্গলকাব্যের কবিগণ এক আশ্চর্য বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। 'পারিবারিক জীবনের সহস্র বন্ধনের মধ্যে নিবিড় সুখ উপভোগ করিতে বাঙ্গালী চিরদিন অভ্যস্ত। দুঃখ-দারিদ্র্য ও ঐহিক অসচ্ছলতা কিছুতেই তাহার এই বন্ধন শিথিল করিতে পারে না। এদেশের নারীজীবনের আদর্শও স্বতন্ত্র। সহস্র দুঃখ-দারিদ্র্য অভাব-অসন্তোষের মধ্যেও তাহাদের দাম্পত্যজীবন অশিথিল থাকিয়া যায়। শিবের মত স্বামীই নারীর আশৈশব জীবনের কাম্য। নিজের স্বামীর মধ্যে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারা নারীজীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। এইজন্য ব্যক্তি হিসাবে স্বামী যাহার যেমনই হউক না কেন, তাহার জন্য কাহারও মনে কোন ক্ষোভ বোধ হয় না। এদেশের স্বামীও যে-কোন অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া

লইয়া দাম্পত্যজীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। বাঙ্গালী কবিগণ শিবকে দাম্পত্যজীবনের আদর্শ স্বামী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। গৃহধর্মের আদর্শই বাঙ্গালীর নিকট সর্বাপেক্ষা বড়; সেইজন্যই তাহার পরিকল্পিত দেবতা আদর্শ গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত।' (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য)। মঙ্গলকাব্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে আগমনী ও বিজয়ার হর-গৌরীর প্রাক্‌রূপ এইগুলিতে ধরা পড়িয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের গার্হস্থ্য জীবন অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। গলায় হাড়ের মালা, সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখা শিব পার্বতীকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার এই রূপ দেখিয়া মেনকার ক্ষোভের অন্ত নাই। তিনি জামাইকে দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন—

মেনকা ঢালিল দধি বরের চরণে।
অঙ্গের ভূষণ দেখে বিষধর গণে॥
অস্থি-ভস্ম-বিভূষণ দেখি কলেবর।
হইয়া বিরসমুখী চিন্তেন অন্তর॥
কান্দয়ে মেনকা সে গৌরীর মায়ামোহে।
ঝলকে ঝলকে বহে লোচনের লোহে॥

শিব মদনমোহন মূর্তি ধারণ করিয়া মেনকার ক্ষোভ দূর করিলেন। বিবাহ হইয়া গেল। অতঃপর আরম্ভ হইল দৈনন্দিন জীবনযাত্রা।

অন্নদামঙ্গলেও শিবের বৃদ্ধ রূপ ও জীর্ণ বেশ দেখিয়া মেনকার ক্ষোভের কথা মনোহর ভঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে। নারদ বিবাহের ঘটক ছিলেন। মেনকা ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে গালি পাড়িতে লাগিলেন—

ওরে নারদ বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥

বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ।
নারদার কথায় করিল হেন কাজ॥

তখন—

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখে বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥

শিবায়ন কাব্যে হর-পার্বতীর কাহিনী সুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যে শিবের পৌরাণিক মাহাত্ম্য ও তাঁহার লৌকিক দুর্গতি-লাঞ্ছনা—এই দুই দিকই সমান গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে শিব এত দরিদ্র যে পার্বতীকে দুইগাছি শাঁখাও কিনিয়া দিতে পারেন না। শাঁখার জন্য পার্বতী অনুনয় করিলে শিব রাগিয়া বলেন—

ভিখারীর ভার্যা হয়ে ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন মনে কর বিসম্বাদ॥
বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥

শাক্ত পদাবলীর আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতেও জামাই শিবের দারিদ্র্য, তাঁহার অধিক বয়স, সংসার সম্পর্কে উদাসীনতা, সিদ্ধিভাং খাওয়া প্রভৃতি লইয়া মেনকার দুঃখ ও ক্ষোভের পরিচয় পাই। উমা রাজকন্যা অথচ তার স্বামী কিনা—

সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষা করে,
যথাকালে যায় হলে দিবা অবসান॥

তদুপরি—

জানতো জামাতার রীতি, সদাই পাগলের মত,
পরিধান বাঘাম্বর, শিরে জটাভার।
আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লোয়ে যায় তারে,
কত আছে কপালে উমার॥

তাই একথা অনায়াসেই বলা চলে যে মঙ্গল কাব্যগুলিতে হরগৌরীর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাকে আমরা অন্ততঃ বহিরঙ্গের দিক দিয়া আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতের প্রাক্‌রূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তবে শক্তি-সাধনার যে সমুন্নত আদর্শ লইয়া শাক্তপদকারগণ আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন মহাকাব্যগুলিতে তাহা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতে হরগৌরীর সাংসারিক তথা বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র থাকিলেও তাহার অন্তরালে 'কে রণ-রঙ্গিনী' এই বোধ সর্বদা জাগ্রত।

বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী

পদাবলী বলিতে সাধারণতঃ বৈষ্ণব পদাবলীর কথাটিই সর্বপ্রথম আমাদের মনে উদিত হয়। পরের দিকে শাক্ত কবিগণের রচিত সঙ্গীতগুলিও পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মধ্য যুগের গীতিকবিতা হিসাবে বৈষ্ণব কবিতার পরই শাক্ত পদাবলীকে স্থান দিতে হয়। আর তাছাড়া বৈষ্ণব কবিতা শাক্ত কবিতাকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কাজেই এই দুই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে স্বভাবতই একটি তুলনামূলক আলোচনার কথা আসিয়া পড়ে।

আকৃতি ও বিষয়বস্তু—প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় যে, আকৃতি (form) ও বিষয়বস্তু (content) এই উভয় দিক দিয়াই বৈষ্ণব পদাবলী শাক্ত পদাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। চতুর্দশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী—এই প্রায় চারশত বছর কাল ধরিয়া বৈষ্ণব পদাবলী বাঙ্গালা সাহিত্যে একক মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ যুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে শক্তিদেবীর বন্দনা রহিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল উগ্রা দেবীকুল ভক্তের নিকট হইতে জোর করিয়া পূজা

আদায় করিতেন। পরে অবশ্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এবং বৈষ্ণবের উপাস্য প্রেমময় দেবতার প্রভাবে ঐ দেবীকুল শান্ত হইয়া আসিলেন। এবং এইজন্যই সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন বাঙ্গলা দেশের সর্বত্র নিদারুণ অত্যাচার ও অনিত্যতা দেখা দিল তখন অত্যাচারের সম্মুখীন হইবার সাহস ও অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার কামনা—এই দুই প্রকার মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভক্ত স্বপ্রয়োজনেই সন্তান বৎসলা দেবীর শরণাপন্ন হইল। ফলে এক গভীর আত্মনিবেদনের ভাব তাঁহাদের রচিত সঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিল। ক্ষুদ্রাকৃতি বৈষ্ণব কবিতাসমূহে কবিরা যেভাবে তাঁহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন শাক্ত কবিদের উপর তাহার প্রভাব অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল।

বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর উৎস—শাক্ত পদাবলীতে যে দেবীর বন্দনা করা হইয়াছে তিনি শক্তিদেবী আর এই দেবীকে সাধনা করিবার যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহা হইতেছে তান্ত্রিক সাধন প্রণালী। মধ্যযুগে ভারতের সকল ধর্ম সম্প্রদায়ই—বৌদ্ধ-তান্ত্রিক, নাথপন্থী, বাউল, সহজিয়া বৈষ্ণব—এই সাধনপ্রণালী দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

আমরা সকলেই অনাদি ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়া এই জগতে আসিয়াছি। ব্রহ্মাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মাই আমাদের স্বরূপ। আমরা এই স্বরূপের কথা ভুলিয়া যাই বলিয়া জাগতিক দুঃখ-যন্ত্রণায় নিপতিত হই। কাজেই আমাদিগকে আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। যে উৎস হইতে সৃষ্ট হইয়া বহুদূরে আমরা চলিয়া আসিয়াছি সেই উৎসে আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে। এই স্বরূপে প্রত্যাবর্তন এবং উহাকে উপলব্ধি ইহাই ভারতীয় সাধনার মূলকথা, ইহাই সত্য-দর্শন। এই সত্য-দর্শনের জন্য ভারতবর্ষে যে সকল সাধনপদ্ধতির প্রচলন আছে তাহা বহুবিচিত্র। কিন্তু এই বৈচিত্র্য

সত্ত্বেও সকলের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। এই সত্যটি হইতেছে আমাদের স্বরূপে প্রত্যাবর্তন।

শক্তিতত্ত্বের মূল কথা হইতেছে অদ্বৈত সত্তার সঙ্গে অভেদে যুক্ত শক্তি হইতেই সর্বপ্রকার সৃষ্টির উন্মেষ। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা অর্থাৎ তাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইবার পূর্বেকার যে অব্যক্ত ও অচিন্তনীয় অবস্থা তাহাই ব্রহ্ম ও অদ্বৈত সত্তা। এই সত্তা নির্বিকার ও নির্বিকল্প। এই সত্তার সঙ্গে এক মহাশক্তি অভেদে যুক্ত রহিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম বা অদ্বৈতসত্তা এবং তৎযুক্ত মহাশক্তিকে আলাদা করা যায় না। 'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়া দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়া সূর্যরশ্মি ভাগ করা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।' সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে এই মহাশক্তির লীলা চলিতেছে। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, তাই শক্তিই অর্থাৎ কালীই ব্রহ্মময়ী। শিবরূপী অদ্বৈত সত্তা ও তাঁহার শক্তি আমাদের এই দেহেই অবস্থান করেন। আমাদের এই দেহখানি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। এই দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে শিব ও শক্তির মিলন করাইতে পারিলেই সর্বপ্রকার ভবযাতনা হইতে আমরা মুক্তি পাইব। তান্ত্রিক সাধনায় এই মিলন ঘটাইবার পন্থার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বৈষ্ণব এই তত্ত্বকেই এইভাবে গ্রহণ করিয়াছেন—অব্যক্ত বা ব্রহ্ম বা পরমপুরুষ আমাদের কাছে তত্ত্ব মাত্র। কিন্তু তিনিই যখন ব্যক্ত হন আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি। লীলার জন্য এই জীব ও জগৎকে (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ জীব ও জগতে অর্থাৎ সীমার মাঝে তিনি ব্যক্ত হইয়াছেন। একদিকে বিশ্বের পরমপুরুষ

আর একদিকে বিশ্বপ্রকৃতি অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টি—এই দুই বস্তু ভিন্ন নহে আবার অভিন্নও নহে। ইহাদের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদের সম্বন্ধ ইহা অচিন্ত্য, মানববুদ্ধির অতীত। ইহাই বৈষ্ণবের অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। কিন্তু প্রকৃতির সহিত বিশ্বের পরমপুরুষের নিত্যলীলা চলিতেছে। বৈষ্ণব দর্শনের ঈশ্বরতত্ত্ব হইতেছে এই পুরুষপ্রকৃতি-সমন্বিত যুগলত্ব। রাধা প্রকৃতির অর্থাৎ জীব ও জগতের প্রতীক। এই প্রকৃতির সঙ্গে ব্রহ্মের বা পরমপুরুষের (বৈষ্ণবের কৃষ্ণ) নিত্য লীলা চলিতেছে। এই দুইকে আলাদা করা যায় না। এইজন্যই বৈষ্ণবেরা যুগল উপাসনা করিয়া থাকেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার উপাস্যতত্ত্বের উৎস এক। ফলে ঐ সকল সাধকদের রচিত সঙ্গীতগুলি একই উৎসকে যে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এইবার দেখা যাক কিভাবে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে।

মথুরা ও বৃন্দাবন এবং কৈলাস ও হিমালয়ঃ স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলন—বৈষ্ণব ও শাক্ত কবিতার মূল ভাব ভক্তি। ভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভক্ত দেবতাকে পরম অন্তরঙ্গ জ্ঞান করে এবং তাঁহার সহিত একটা সম্পর্ক পাতাইয়া তাঁহাকে সেইভাবে উপাসনা করিয়া থাকে। বৈষ্ণবরা তাঁহাদের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণকে সখারূপে, সন্তানরূপে এবং সর্বোপরি নিজেকে কান্তারূপে ভাবিয়া উপাস্য দেবতাকে কান্তরূপে উপাসনা করিয়াছেন; শক্তি সাধকগণও তাঁহাদের উপাস্যা দেবীকে কন্যারূপে ও জননীরূপে উপাসনা করিয়াছেন।

তত্ত্বের দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে শ্রীরাধার সঙ্গে নিত্যলীলায় রত। এই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামেই তিনি যশোদানন্দরূপে বাল্যলীলা করিয়াছেন। কংস নিধনের জন্য বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি মথুরা গিয়াছিলেন এবং শ্রীমতীকে অকূল বিরহসাগরে ভাসাইয়া-ছিলেন। কিন্তু এই তান্ত্রিক ও পৌরাণিক কাহিনী বৈষ্ণব কবিগণের

হাতে আমাদের নিজেদের ঘরের কথায় পরিণত হইয়াছিল। জননী যশোমতী তো আমাদেরই জননী। গোপালের প্রতি তাঁহার স্নেহ, তাঁহার মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগ, দুষ্ট গোপালকে তাড়না-ভর্ৎসনা, ধেনু চরাইতে যাওয়ার সময় গোপাল ও তাহার সখাগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া প্রভৃতির চিত্র এত জীবন্ত করিয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ অঙ্কিত করিয়াছেন যে, মনে হয় মথুরা ও বৃন্দাবন যেন বাঙ্গলারই ছায়া-সুনিবিড় পল্লীনিকেতন। বৃন্দাবনের কুঞ্জে রাধার অভিসার, সখীগণের সঙ্গে যমুনায় জল আনিতে যাওয়া, কদম্বমূলে কৃষ্ণের বংশীবাদন প্রভৃতি চিত্রের মধ্য দিয়াও একই চিত্র ফুটিয়া উঠে।

বাঙ্গালী শাক্ত কবিগণ হিমালয় ও কৈলাসকে বাঙ্গলার পল্লীতে টানিয়া আনিয়াছেন। বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে বাঙ্গালীর পারিবারিক আলেখ্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। গিরিরাজ হিমালয়, তদীয় পত্নী মেনকা, তাঁহাদের কন্যা উমা এবং জামাই মহাদেব, ইঁহাদের স্নেহ-ভালবাসা, মান-অভিমান, মিলন-বিরহের কথাই এই সঙ্গীতগুলির বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তুর একটা তত্ত্বগত দিক আছে বটে, মেনকার স্নেহের দুলালী উমা অকস্মাৎ রণরঙ্গিনী মূর্তিও ধারণ করিয়া ফেলেন কিন্তু তাহা নিতান্তই আরোপিত বলিয়া মনে হয়। এই গানগুলি শুনিয়া আমাদের পক্ষে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয় বা কৈলাসের কথা চিন্তা করা সম্ভবপর হয় না। আমাদের মনে তখন ভাসিয়া উঠে শেফালিকাগন্ধবিধুর পল্লীবাঙ্গলার গৃহস্থের অঙ্গনটির কথা। প্রবলপ্রতাপান্বিত নগাধিরাজকে স্নেহপরায়ণ অথচ গম্ভীর বাঙ্গালী পিতা বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রতি ঘরে বিবাহিতা কন্যার সংবাদ শুনিবার জন্য যে স্নেহবুভুক্ষু মাতৃহৃদয় সদা অপেক্ষমান মেনকার মধ্যে আমরা সেই মাতৃহৃদয়ের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। উমা আমাদেরই ঘরের আদরিণী কন্যা। তাহাকে কিছুতেই আমরা

ভয়ঙ্করী কালী বলিয়া ভাবিতে পারি না। সে তো আমাদের কাছে বিবাহের পরে পিতৃগৃহ হইতে নির্বাসিতা কন্যা ছাড়া আর কেহ নহে। শিব সম্পন্ন বাঙ্গালী গৃহস্থের কুলীন কিন্তু দরিদ্র জামাই। এই যে পারিবারিক চিত্রটি ইহা কল্পলোক হিমালয় বা কৈলাসের অন্তর্গত বলিয়া আমরা কেমন করিয়া ভাবিতে পারি?

বৈষ্ণব ও শাক্ত কবিরা মানবিক প্রেমের আধারেই ভগবৎ প্রেমকে ব্যক্ত করিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা মানবের সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছেন। 'যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে।' এইতো গেল বাৎসল্য রসের পদের কথা।

মধুর রসের পদে বৈষ্ণব কবিতায়. প্রেমের এমন উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিয়াছে যাহা আমাদিগকে আমাদের এই কান্নাহাসি বিজড়িত ধরিত্রীর প্রেমের কথাই মনে করাইয়া দেয়। কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া রাধার আকুলতা, নায়ক-নায়িকার মিলন-পূর্বক দর্শন ও শ্রবণ হইতে জাত প্রগাঢ় অনুরক্তি, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য রাধার অভিসারে যাত্রা প্রভৃতি বিষয় বৈষ্ণব কবিরা এমন জীবন্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, যাহা আমাদিগকে ঘরের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। মনে প্রশ্ন জাগে—

> শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
> পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
> অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
> বৃন্দাবন-গাথা,—এই প্রণয়-স্বপন

শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে,—একি শুধু দেবতার।

আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নিবেদন করি। কাজেই যাহাকে ভালবাসি তাহারই মধ্য দিয়া যদি দেবতার সেবা করি তবে অপরাধ কোথায়? 'যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে।'

শাক্ত পদাবলীতে উপাস্যা দেবীকে কন্যারূপে এবং জননীরূপে সাধনা করা হইয়াছে। বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে বাৎসল্য রসের প্রকাশ ঘটিয়াছে। অন্যান্য পদগুলিতে ঐ একই রসের প্রকাশ। ঐগুলিতে ভক্ত সন্তান আর দেবী জননী। জননীর নিকট সকল রকমের আদর, আব্দার ও অভিমান। যদিও জননীর ভয়ঙ্করী মূর্তির প্রকাশ ঐ পদগুলিতে ঘটিয়াছে তবুও তাঁহাকে ঘরের মা বানাইয়া শাক্ত কবিরা তাঁহার নিকট সর্বপ্রকার আকুতি জানাইয়াছেন। কাজেই শাক্ত ও বৈষ্ণব পদাবলী, এক কথায় সমগ্র বাঙ্গলা পদাবলী সাহিত্যে স্বর্গ ও পৃথিবীর মিলন ঘটিয়াছে এবং এই পদাবলীর আবেদন চিরকাল থাকিবে।

মধুর রসের সাধনা : শক্তিময়ী দেবী ও প্রেমময়ী দেবী—

মধুর রসের ভজনাই বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য বস্তু, মধুর রসে ভগবান কান্ত, ভক্ত কান্তা। সর্বশক্তিমান রসস্বরূপ পরমপুরুষ কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহারই সৃষ্ট জীবের প্রতীক চিরযৌবনা রাধার নিত্য মিলন লীলা

চলিতেছে। এই মিলন-মধুর লীলাকে বৈষ্ণব কবিরা অপূর্ব মনোহর ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মানুষের কাছে মধুর রসের আবেদনই সর্বাপেক্ষা অধিক, এইজন্য বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রধানতঃ মধুর রসকেই আশ্রয় করা হইয়াছে যাহাতে ইহা অতি সহজেই মানুষের হৃদয়বেদ্য হইয়া উঠিতে পারে। বৈষ্ণব কবিতার মূলভাব ভক্তি, ভক্তির প্রধান কথা হইল দেবতার উপর পরম নির্ভরতা। ভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই ভক্ত দেবতাকে পরম অন্তরঙ্গ জ্ঞান করে এবং তাঁহার সহিত একটা সম্পর্ক পাতাইয়া সেইভাবে তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকে। বৈষ্ণবরা তাঁহাদের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণকে সখারূপে, সন্তানরূপে এবং সর্বোপরি নিজেকে কান্তারূপে ভাবিয়া উপাস্য দেবতাকে কান্তরূপে উপাসনা করিয়াছেন। এই সাংসারিক সম্পর্কগুলি বড়ই মধুর এবং এইগুলি প্রকাশ করিতে গেলে মধুর রসেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

শক্তিসাধকগণ তাঁহাদের উপাস্যাদেবীকে কন্যারূপে এবং জননীরূপে উপাসনা করিয়াছেন। যদিও শক্তিসাধকগণের উপাস্যাদেবী ভয়ঙ্করী তবুও এই ঘোরাদেবীকে শক্তিসাধকরা মধুররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে (বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর উৎস দ্রষ্টব্য) শাক্ত ও বৈষ্ণবের উপাস্য তত্ত্বের উৎস এক, তাই বৈষ্ণবের প্রেমময়ী দেবী ও শাক্তের শক্তিময়ী দেবী আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন হইলেও তাঁহারা মূলতঃ এক। বৈষ্ণব শ্রীরাধার ভাবের আনুগত্যময়ী হইয়া পরমপুরুষকে ভজনা করিয়াছেন, পরমপুরুষের শক্তি হইতেছেন শ্রীরাধা। অসীম ও অব্যক্ত ব্রহ্ম লীলার জন্য এই জীব ও জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শ্রীরাধা এই জীব ও জগতের প্রতীক কিন্তু তিনি পরমপুরুষ হইতে অভেদ নহেন। পরমপুরুষ কৃষ্ণ ও তাঁহার আনন্দাংশ হইতে সৃষ্ট জীব ও জগৎ—যাহার প্রতীক রাধা মূলতঃ এক। তেমনই শাক্তের নিকট ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি এক, এই শক্তিকেই শাক্তরা জগজ্জননীরূপে বন্দনা করেন। তাঁহারা মনে

করেন যে শক্তিযুক্ত ব্রহ্ম এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্বষ্টির মূলে রহিয়াছেন। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, তাই কালী ব্রহ্মময়ী। এই ব্রহ্মময়ী কালীর সাধনা ভয়ঙ্করের সাধনা হইলেও বাঙ্গালী কবিরা তাঁহাকে মধুর রসের দ্বারা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। 'দেখা যাইতেছে, বাঙালী কবিগণ বৈষ্ণবই হোন আর শাক্তই হোন, মূলে সকলেই মধুর রসের উপাসক। আমরা দেখিতে পাই মাতৃদেবীর ইতিহাসে পার্বতী উমার একটি বিশিষ্ট ধারা, অসুরনাশিনী দেবীর আর একটি পৃথক্ ধারা। পৌরাণিক যুগেই এই দুই ধারা একত্রে মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বাঙালী কবিগণ ঐতিহ্যসূত্রে মায়ের এই মিশ্ররূপই প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, জল ও দুগ্ধের মিশ্রণের ভিতর হইতে হংস যেমন দুগ্ধকেই পান করিবার চেষ্টা করে, বাঙালীর কবি মনোহংসও তেমনই ভাবে মায়ের মধুররূপিণী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির মিশ্রণ হইতে সহজাত প্রবণতাবশে মধুররূপিণীকেই বাছিয়া আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, মাকে লইয়া বাঙ্গলাদেশের জনমনেরই যেন এই মধুর রসের দিকে ঝোঁক। তাই দেখি, বাঙ্গলাদেশের প্রসিদ্ধতম মাতৃপূজার উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসবকে পণ্ডিত মহলে বা উচ্চকোটী মহলে যতই মার্কণ্ডেয় 'চণ্ডী'র সহিত যুক্ত করিয়া অসুর-নাশিনী দেবীর পূজা-মহোৎসব করিয়া তুলিবার চেষ্টা হোক না কেন, বাঙ্গলার জনমানস মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর তেমন কোনও ধার ধারে না। জনগণ প্রতিমায় দেবীকে অসুর-নাশিনী মূর্তিতে দেখেন—কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তাহার পরে তাঁহারা স্থির নিশ্চিতরূপে জানেন—আসলে আর কিছুই নয়—মায়ের স্বামিগৃহ কৈলাস ছাড়িয়া বৎসরান্তে একবার কন্যারূপে পুত্র-কন্যাদি লইয়া বাপের বাড়ি আগমন। তিনদিনের বাপের বাড়ীর উৎসব-আনন্দ—তাহার পরেই আবার চোখের জলে বিজয়া—স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন, গণমানসের এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই ভ

আমাদের এত 'আগমনী-বিজয়া' সঙ্গীতের উদ্ভব। এই সঙ্গীতগুলিতে লক্ষ্য করিতে পারিব, গিরিরাজ যখন কন্যা উমাকে লইয়া গিরিপুরে ফিরিয়া আসিলেন তখন গিরিরাণী কন্যাকে বুকে লইতে এলোকেশে ধাইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু দাশরথি রায় তাঁহার পদাবলীতে বলিলেন, মেনকা দশভুজা রণরঙ্গিণী দেবীকে কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিতেই চাহিলেন না, মা স্পষ্টই বলিলেন,—

কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী!
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী?

এই রণরঙ্গিণীকে মেনকা এবং তাঁহার মারফতে বাঙ্গালী কবিমন—শুধু যে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না তাহা নহে—তাঁহাকে উমা বলিয়া চিনিতে পারিলেন না।' (ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত)

শুধু আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীতে নয় জগজ্জননীর রূপবর্ণনার মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই বাঙ্গালী কবিরা ভয়ঙ্করী দেবীকে অন্তরে মধুর করিয়া লওয়ার জন্য কি ব্যাকুল প্রচেষ্টা করিয়াছেন। মহাদেবের দেহ তুষারের মত শুভ্র। জগজ্জননী শ্যামা যেন মহাদেবের বক্ষে নীলপদ্মের মত শোভা পাইতেছেন—

তুষার ধবল হ্রদে নীলিম নলিনী।
হর-হৃদি-মাঝে আমার শ্যামা মা জননী॥
রূপ সে তিমিররাশি, অথচ তিমির নাশি'
উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী॥

(যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর)

মহারাজ মহাতাব চাঁদ তান্ত্রিক ধ্যানমন্ত্রের অনুসরণে দেবীর ভীষণা মূর্তির বর্ণনাতে সবিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু পরিণামে তাঁহার কল্পনাতেও 'সহাস্য বদনান্বিতা, মধুরবচনা' দেবীর মূর্তিই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তিনি যখন বলেন—

এ কি রূপ হেরি নয়নে, বর্ণের লাবণ্য সুদুষ্কর বর্ণনে
প্রফুল্ল কমলাসন, তদুপরি কৃতাসন, চপলা-জিত বরণ,
মৃদু হাস্য চন্দ্রাননে ॥

তখন এই দেবীকে কিছুতেই ভয়ঙ্করী বলিয়া ভাবিতে পারা যায় না। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য দেবীর কপালে সিঁদুর পরাইয়াছেন এবং পায়ে নূপুর পরাইয়া দেবীর ভয়ঙ্করী রূপকে মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন। মাকে দেখিয়া কবির মনে হইয়াছে—

নব জলধর কায়।
কালো রূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায়।

মায়ের দানব-সংহারিণী মূর্তির মধ্যেও বাঙ্গালী কবি তাঁহার মধুর রূপের সন্ধান করিয়াছেন। শ্যামা দানব নিধন করিতেছেন, তাঁহার দেহ রুধিরে ভাসিয়া যাইতেছে। এই রূপ দেখিয়া কবির মনে হইতেছে যেন কালিন্দীর কালো জলে রক্তবর্ণ কিংশুক ফুল ভাসিতেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইতেছে মায়ের মুখখানি যেন নীল কমল—চূড়ার অর্ধচন্দ্র এই নীল কমলের উপরই অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে—

বামা রণে দ্রুতগতি চলে, চলে দানব-দলে, ধরি করতলে
গজ গরাসে ॥
কে রে কালীর শরীরে, রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে
কিংশুক ভাসে।
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, অর্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥

বৈষ্ণব ও শাক্ত কবিগণের সমাজ-চেতনা—বৈষ্ণব পদাবলীকে সমাজ জীবনের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্করহিত বলা চলে। ইহাতে কল্পলোকের প্রেম মধুরতা বাস্তব জীবনের কুশ্রীতাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে দৈনন্দিন জীবনের শুধুমাত্র সেই সকল দিকই গ্রহণ করা হইয়াছে যাহার আধারে অধ্যাত্মতত্ত্ব ফুটাইয়া তোলা

সম্ভব। 'বৈষ্ণব পদাবলীতে অধ্যাত্মরহস্যকে পরিবারকেন্দ্রিকরূপে দেখাইবার চেষ্টা আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের রসলীলার প্রকৃত পটভূমিকা অপ্রাকৃত বৃন্দাবন, যেখানে পরিবার জীবনের ছায়ারূপ আছে, কিন্তু কায়ারূপ নাই।'

কিন্তু শাক্ত পদাবলীতে সমাজজীবনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহাতে অত্যন্ত নগ্নভাবে সাংসারিক জীবনের দীনতা, কুশ্রীতা রূপ লাভ করিয়াছে। পরিবার-কেন্দ্রিক বাঙ্গালীর জীবন আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।* ইহা ছাড়া ভক্তের আকৃতি শীর্ষক পদগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর নৈরাজ্যিক অবস্থার চিত্র শাক্ত কবিদের সঙ্গীতে প্রতিফলিত হইয়াছে। ('অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালী সমাজ' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য—নামকরণ ও ভাবের দিক দিয়া এক হইলেও শাক্ত ও বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। আবার তেমনি এই মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় পদাবলীর কতকগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাদৃশ্যও অনস্বীকার্য। 'শাক্ত সঙ্গীতের প্রথম কবি রামপ্রসাদ; রামপ্রসাদের সঙ্গীত রচনার মধ্যে একটা স্বতঃ উৎসারণ সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি। সুতরাং রামপ্রসাদের শাক্ত সঙ্গীত রচনার পশ্চাতে বৈষ্ণব পদাবলীর কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল একথা বলিতে পারি না। রামপ্রসাদের প্রেরণার উৎস তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। কিন্তু প্রেরণার যখন বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন পরিবেশের নিকট হইতে তাহা অনেক কিছুই গ্রহণ করে—ভাবের দিক হইতেও প্রকাশভঙ্গির দিক হইতেও। দ্বাদশ শতক হইতেই বাঙ্গলা দেশে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসার বলিতে পারি। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সহস্র সহস্র বৈষ্ণব পদ রচনার

* আগমনী ও বিজয়া—অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

ভিতর দিয়া সে ধারা প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। এইরূপে বহু শতকে প্রবাহিত সাহিত্যের একটি অতি সমৃদ্ধ ধারা একটি বিশেষ সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়িয়া তুলিয়াছিল ও রামপ্রসাদ এবং তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী শাক্ত কবিগণের সঙ্গীতগুলির উপরে এই পরিবেশের প্রভাব অতি স্বাভাবিক ভাবেই পড়িয়াছিল।'

(ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত)

উভয় পদাবলীর সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলি মোটামুটি এইরূপ :—

(ক) ভক্তিরস উভয় পদাবলীর মূল উপজীব্য। ভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বৈষ্ণব পরমপুরুষকে সখা, সন্তান এবং কান্তরূপে কল্পনা করিয়াছেন, আর শাক্ত করিয়াছেন কন্যা ও জননীরূপে। বৈষ্ণবপদাবলীর পদগুলির সঙ্গে শাক্ত পদাবলীর বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়ার অদ্ভুত সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয় পদাবলী হইতে পদ উদ্ধৃত করিয়া ইহা অনায়াসেই প্রমাণ করিতে পারা যায়।

(খ) বৈষ্ণব পরমেশ্বরকে কান্তরূপে আর শাক্ত জননীরূপে লাভ করিতে চায়। এই লাভ করিবার পন্থা অর্থাৎ সাধনপদ্ধতি উভয়ের বিভিন্ন। শাক্তের সাধ্য বস্তু নারী আর বৈষ্ণবের পুরুষ ইহাই উভয়ের প্রধান পার্থক্য নহে। উভয়ের সাধন রীতির বিভিন্নতাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

(গ) উভয়ই পদাবলীতেই মধুর রসের প্রকাশ ঘটিয়াছে।

(ঘ) শাক্ত পদাবলীতে সমাজ-সচেতনতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলীতে ইহা প্রায় অনুপস্থিত।

(ঙ) শাক্ত পদাবলীতে বহির্জীবনের প্রকাশ সমধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, বৈষ্ণব পদাবলীতে অন্তর্জীবনের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে।

(চ) উভয় পদাবলীকেই গোষ্ঠীগত সাহিত্য বলা যাইতে পারে।

(এই প্রসঙ্গে 'শাক্ত পদাবলী পাঠের ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গালী ঐতিহ্যের সমন্বয়ের সুর ও শাক্ত পদাবলী

বাঙ্গালীর চরিত্রে একটা সমন্বয়ের সুর অনায়াসেই লক্ষ্য করিতে পারা যায়। সেই আর্যসভ্যতা বিস্তারের যুগ হইতেই আমরা দেখি যে কিভাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এই দেশটি আস্তে আস্তে ভারতের বিভিন্ন ধারাকে আত্মদেহে স্থান করিয়া দিতেছে। শুধু বাঙ্গলা দেশই বা বলি কেন সমগ্র ভারতবর্ষেরই এই এক ধর্ম—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'। বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়ের সুর ইহাই ভারতের বৈশিষ্ট্য। এই সুর বাঙ্গলা দেশে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। দ্রাবিড়-মঙ্গোল-অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ দ্বারা অধ্যুষিত এই দেশ একদিন আর্যসভ্যতা গ্রহণ করিল। তারপরে আসিল বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, আসিল তান্ত্রিক, বাউল, নাথপন্থী, মুসলিম ইত্যাদির প্রভাব ; তারপর অকস্মাৎ সব কিছুই একদিন মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বন্যায় ভাসিয়া গেল। ইংরেজী সভ্যতাকেও বাঙ্গলা দেশ সর্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই আমরা দেখিতেছি যে বাঙ্গালীর ঐতিহ্যে সমন্বয়ের সুরটি কি প্রবল। শাক্ত পদাবলীতেও এই সমন্বয়ের সুর বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

বাঙ্গালীর শাক্ত পদাবলীতে বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়াছে। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ—ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার এই তিনটি পথ। গীতায় এই তিনের সমন্বয় সাধন করিয়া ভক্তিকে সকলের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত উপাসনাতে এই তিনের সমন্বয় ঘটিয়াছে। তন্ত্র স্থূল উপাসনা হইতে সূক্ষ্মের পথে যাত্রার ইঙ্গিত দেয় ; তান্ত্রিক সাধকগণ এক উদার দৃষ্টিতে এই বিশ্বজগৎকে অবলোকন করেন। মানুষে মানুষে তাঁহারা পার্থক্য স্বীকার করেন না। সাধনার উচ্চমার্গে উঠিলে বিশ্বমানবের প্রতি

করুণা, মমতা ও সহানুভূতিতে সাধকের মন পূর্ণ হইয়া যায়। সর্বপ্রকার ভেদজ্ঞান তাঁহার লোপ পায়। তখন তিনি বলেন—

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাম দুর্গা কালী রাধা শ্যাম
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী।

তাই আমরা দেখি পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ মুসলমান, খৃষ্টান, বৈষ্ণব—সর্বভাবে অদ্বৈতসত্বাকে উপাসনা করিয়াছিলেন।

শাক্ত পদাবলীর কবিবৃন্দ

শ্রদ্ধেয় অমরেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'শাক্ত পদাবলী'তে শতাধিক শাক্তকবির গান সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, 'শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত আমাদের ভাষা-ভাণ্ডারে যে কত আছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা অসাধ্য ব্যাপার।' এই অসংখ্য সঙ্গীতরচয়িতার বিস্তৃত বিবরণ এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, নবীনচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বঙ্গের সমগ্র কবিকুল মাতৃবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই রচয়িতাগণ আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে আসিয়াছেন। রাজা, জমিদার, দেওয়ান, সাধক প্রভৃতি সম্মানিত ব্যক্তিরা ছাড়াও যাত্রা, টপ্পা, কবিওয়ালারাও এই কবিদলের অন্তর্ভুক্ত। আর সমগ্র বাঙ্গালী সমাজ হইল এই সঙ্গীতের শ্রোতা।

শাক্তপদকারগণের মধ্যে রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মহারাজ মহাতাবচাঁদ, রামলাল দাস দত্ত, রসিকচন্দ্র রায়, শম্ভুচন্দ্র রায়, দাশরথি রায়, রাম বসু, কুমার নরচন্দ্র

রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শাক্তপদকারগণের ভাব, ভাষা, ভঙ্গী প্রায় এক আর বিষয়বস্তুও এক—মাতৃবন্দনা। ইঁহারা সকলেই যেন এক কবিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। স্বতন্ত্রভাবে ইঁহাদের কাব্যকৃতি আলোচনার বিশেষ অবকাশ নাই। এই কবিকুলের মধ্যে রামপ্রসাদ সর্বাগ্রগণ্য। প্রসাদী সঙ্গীত বা মালসী (দেবী-বিষয়ক সঙ্গীত—মালসী একটি রাগিণীবিশেষ) আর শাক্ত পদাবলী প্রায় একার্থবোধক।

রামপ্রসাদঃ মানবতার সহিত আধ্যাত্মিক আকুতির সংযোগ—রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১৭২০-২৫এর মধ্যে) হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের জীবনী এবং সাধনা সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। রামপ্রসাদের জন্মলগ্নে বাঙ্গলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। প্রজার উপর নবাব, জমিদার ইত্যাদির নির্মম শোষণ, মহাজন, বণিক প্রভৃতির উপর দস্যুর অত্যাচার, অবাধ লুণ্ঠন, নরহত্যা, অনিশ্চিত জীবন যাপনের আতঙ্ক—ইহাই ছিল তখনকার দিনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই হতাশায় পরিপূর্ণ নিরানন্দ জীবনের নৈরাশ্য ও চিত্তদীর্ণ হাহাকার রামপ্রসাদ সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই সঙ্গে অভীপ্সিত দেবীকে অন্তরে উপলব্ধি করিবার দুর্বার কামনা তাঁহার সঙ্গীতে ভাষা পাইয়াছে। ফলে তাঁহার সঙ্গীতগুলি মানবতার সহিত আধ্যাত্মিক আকুতির ঘনিষ্ঠ সংযোগে পরম রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

অত্যাচারের সম্মুখীন হইবার সাহস এবং অত্যাচার উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা এই দুই-ই তিনি জগজ্জননীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। ভুবনমোহিনী জননীর রূপচ্ছটায় তাঁহার অন্তর উদ্ভাসিত ছিল তাই সাংসারিক পীড়নকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। 'সংসারের থেক্ক্যা

খাতাকে তিনি ভক্তির স্বর্ণসূত্রে শতপাকে জড়াইয়াছেন। তিনি হিসাবের বইএ কালীনাম লেখেন; জগদীশ্বরী কন্যারূপে তাঁহার বাড়ীর বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করেন। আদালতের পেয়াদা যখন তাঁহার উপর ডিক্রিজারী করিতে আসে তখন তাহার তকমার উপর কালীনামের শীলমোহর অঙ্কিত থাকে। সংসারের শত তুচ্ছ অভাব-অভিযোগ, পীড়ন-অপমানের রন্ধ্রপথ দিয়া তিনি কালীর কল্যাণ হস্তের স্পর্শ অনুভব করেন। জীবনের খেলা-ধূলা, ক্রীড়া-কৌতুক সবই তাঁহার কাছে অধ্যাত্মলোকের দ্বার উন্মুক্ত করে। পাশাখেলায় এক অদৃশ্য হস্ত তাঁহার দান উল্টাইয়া দেয় ও পাকা ঘুঁটিকে কাঁচা করে ও কাঁচাকে পাকাইয়া দেয়। মন-ঘুড়ি কালীপদ আকাশের ঊর্ধ্বলোকে উড়িতে উড়িতে হঠাৎ কু-বাতাসের ঝাপটায় পৃথিবীর কাছাকাছি নামিয়া আসে ও আবিল বায়ুস্তরে মাথা লুটাইয়া পড়ে। প্রত্যেকটি ব্যবসায় ও বৃত্তি অপার্থিব জীবনসাধনার প্রতীকরূপে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয়। কৃষিকর্মরত কৃষককে দেখিয়া অকস্মাৎ তাঁহার মনে জাগে যে, স্বর্ণপ্রসূ মানবজীবন অকর্ষিত রহিয়া গেল। এবং চাষের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার রূপকে সাধনার সমস্ত ক্রমগুলি তাঁহার মনে পুনরাবৃত্ত হয়। চোখে ঠুলি-আঁটা কলুর বলদ তাঁহাকে অনিবার্যভাবে মোহান্ধ, প্রবৃত্তি-তাড়িত মানবজীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জেলের জাল ফেলায় মৎস্য-কুলের আকুলতা মহাকালের পাশবদ্ধ হইবার জন্য অসহায়ভাবে প্রতীক্ষমান মানবের করুণ চিত্রটি তাঁহার মনে ফুটাইয়া তোলে।'

(ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

এই সকল চিত্র রামপ্রসাদ রূপকের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ফলে রামপ্রসাদের কবিতাগুলি চিত্রকাব্যে পরিণত হইয়াছে। রামপ্রসাদের কবিতা নিঃসন্দেহে তত্ত্বপ্রধান। আর তত্ত্বগুলি এমন সব রূপককে আশ্রয় করিয়াছে যাহা অনেক সময় নিরতিশয় দুর্বোধ্য বলিয়া

মনে হয়। কিন্তু একথাও ঠিক যে, রূপকের আবরণ উন্মুক্ত করিতে পারিলে রামপ্রসাদের কাব্যের রসে মন পরিপূর্ণ হয়। মধ্য যুগের কবি মুকুন্দরামের পরেই রামপ্রসাদকে আমরা জীবনরসাশ্রায়ী কবি বলিতে পারি। তাঁহার কাব্যের মধ্যেই আমরা তাঁহার জীবনাভিজ্ঞতার রসরূপ দেখিতে পাই।

গ্রন্থপঞ্জী

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—ভারতীয় সাধনার ঐক্য

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী—তন্ত্রকথা

ক্ষিতিমোহন সেন—ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা

ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী—শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা

ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য—ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ

অমরেন্দ্রনাথ রায়—সমালোচনা সংগ্রহ

Dr. Bhandarkar—Vaishnavism, Saivism and Minor Religions·Systems.